দাদিবুঢ়া

গোপীনাথ মহান্তি

অনুবাদ : রত্না সাহা

১

ওখানে দূরের দিগ্‌বলয় ততটা দূরে মনে হয় না। যেদিকে তাকাও পথের এদিকে তিন পা ও ওদিকে তিন পার মধ্যে চোখ আটকে থাকে। তারই মধ্যে চারিদিকে ঘেরা সুন্দর পাহাড়।

সার দিয়ে রাখা অগুনতি উড়োজাহাজের মতো পাহাড়ের পর পাহাড় সাজানো রয়েছে। মধ্যিখানের উপত্যকায় ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়ের ঢাল নেমেছে। সেগুলি আবার ঘন জঙ্গলে ঢাকা।

সুন্দর উপত্যকার বুক চিরে রূপালী মুরান নদী কুল্ কুল্ করে বয়ে চলেছে পাহাড়ী দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

এই পাহাড়ী দেশের একটি গ্রামের নাম লুল্লা। তার মাথার উপরে চাঁদোয়ার মতো রাতের আকাশ অন্ধকার ও তারায় ঠাসা। পাহাড় যেন তাকে ধরে রাখতে পারছে না। নিস্তব্ধ রাতের আকাশ মনে হয় আরো দূরে চলে গেছে। সেই গভীর অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে লুল্লা গ্রামের পাঁচজন লোক এগিয়ে চলেছে। দুই দিকে ঘন জঙ্গল— বাঘের রাজ্য।

একহাতে জ্বলন্ত মশাল ও অন্য হাতে ঠক্ ঠক্ করতে করতে পাহাড়ের শুঁড়িপথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে গ্রামের নায়ক রাম মুদুলি, নাপিত চাঞ্চেরী ডোম, জানি, হরিজানি ও খ্রীষ্টান পাড়ার প্রাচীন এলিয়ো সুন্না।

উঁচু পাহাড়ের মাথা টপ্‌কে তারা নিচের দিকে নামতে শুরু করা মাত্র ওদের সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চারদিকের গোল পাহাড়ের গায়ে যেন দীপাবলীর মহোৎসব। পাহাড়ের গায় আগুন কী সুন্দর দেখায়। ওদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে বিদ্যুতের বাঁকা দাগের মতো আগুন খেলে বেড়াচ্ছে। কোথাও বা পাহাড়কে গোল করে ঘিরে জ্বলছে। অন্যদিকে লম্বা রেখার মতো এদিক থেকে ওদিক। ঘন অন্ধকারে পাহাড় আর আকাশ মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। মনে হয় যেন কোন অজানা জাদুকর বিরাট বিস্ময়ে অন্ধকারে আগুনের খেলা শুরু করে দিয়েছেন। আগুনের ফুল, আগুনের বিদ্যুৎ লতা, আগুনের অলংকার ক্রোশ ক্রোশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আকাশ থেকে পাতালে, পুব থেকে পশ্চিমে। অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশ।

বনের মানুষগুলি দূরের, কাছের ও আঁধারী শূন্যে এই আগুনের খেলা তাকিয়ে দেখতে লাগল।

সময়টা ফাল্গুনের শেষাশেষি। কোরাপুটের পাহাড়ের গায়ে ফিরিঘাস শুকিয়ে গিয়ে থাকে —বুটার ঘন ঝোপও শুকিয়ে গিয়েছে।

বনের মানুষেরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। প্রতিবারই তারা দেখে তবুও লুল্লার ঢাল পেরলে আগুনের খেলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে না দেখে তারা নিজের দিকে পা ফেলতে পারে না।

চাঞ্চেরী ডোম রাস্তার ধারে শুকনো ফিরিঘাসের জঙ্গলের কাছে গিয়ে আগুনে ফুঁ দিল। রাম মুদুলি একদিকে, হরিজানি অন্যদিকে শুধু খেলার ছলে জঙ্গলে আগুন ধরাল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল, আগুন ছড়িয়ে গেল। এইভাবে পিছনে আগুন লাগাতে লাগাতে পাঁচ বন্ধুত্বে নিচের ঢাল বেয়ে নামতে থাকল।

গ্রাম কাছে আসাতে ওদের সকলের মুখে হাসি ফুটল। আলোতে মন খুশি হয়ে ওঠে। সাত পাঁচ বিচার করতে মন চায়। অন্ধকারে চিন্তা ভাবনা বাড়ে। অন্ধকারে বিদ্যুতের মতন এই বিরাট দাবাগ্নি কিভাবে হল, কে করল, কিভাবে ছড়িয়ে গেল, আর এত সুন্দর দেখাল, এই আলোচনা ওদের মধ্যে শুরু হল।

এলিয়ো প্রাচীন বুড়ো মানুষ। খ্রীষ্টান হবার পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। বাবা, মা আদর করে নাম রেখেছিল—কুমুটি— ছেলে, বয়স হলে রোজগার করে সম্পত্তি কিনে কুমুটির মতো বিরাট ধনী হবে। এলিয়ো বোঝাল— "দেখো, আমরা জ্বালাতেই না আগুন জ্বলছে। তোমরা পরজা সম্প্রদায়ের লোকরা বলবে ভূতে আগুন লাগিয়েছে, *ডুমা* আগুন লগিয়েছে— সব মিছে কথা।"

চাঞ্চেরী ডোম সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মিছে কথা— জুমা ফুমা সব মিথ্যে।" হরি জানি বলল— "এখানে না হয় আমরা লাগিয়েছি, কিন্তু ওই দূরে যে ক্রোশ জুড়ে আগুন জ্বলছে আকাশের আধাআধি অব্দি সেখানে কোন মানুষ আগুন লাগাতে গিয়েছিল শুনি? সে সব আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের কাজ। তারাই ডুমা। তারাই ওখানে আগুন লাগিয়েছে।"

চাঞ্চেরী ডোম বলল— "সত্যি কথা। তারাই আগুন লাগায়। ডুমা নি নেই নাকি?" প্রাচীন বলল— "মানুষরা দিনের বেলায় সেখানে আগুন লাগিয়ে এসেছিল। রাতেও সেই আগুন জ্বলছে। এখন যেমন এই পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি— দিনের বেলায় অন্য লোকেরা ওখানে গিয়েছিল।" রাম নায়ক প্রতিবাদ জানিয়ে বলল— "তুমি কি কাউকে দেখেছিলে?"

প্রাচীন জিজ্ঞাসা করল— "ডুমাকে আগুন লাগাতে তুমি কি দেখেছ?"

হরি জানি উত্তর দিল— "তুমি বা আমরা কেউই দেখিনি এ আগুন কে লাগিয়েছে। তুমি ভাবছ এটা মানুষের কাজ, আর আমরা ভাবছি ডুমার। কেন তোমার

ডুমা— মৃতের আত্মা

কথা ঠিক হবে? আর আমরা যা বলছি সব ভুল হবে? তোমার কাছে তুমি ঠিক— আমরা আমাদের কাছে ঠিক।"

চাঞ্চেরী বলল— "এটা ঠিক কথা।"

রামা নায়ক বলল— "ডুমা নয় তো কে লাগিয়েছে? সেই তো রাত করল, তারা করল, পাহাড়, *ডংগব* সব করল। আগুন ওই লাগিয়েছে, অনাবৃষ্টি সেই করে। এতো আর আজকের কথা নয়— যুগ যুগ ধরে এ আমাদের বাবার বাবার, দাদুর দাদুর সময়কার কথা। তোমরা ডোম লোকেরা এ কথা বুঝতে পারবে না। তোমাদের সাহেবকে এই রাত্রে এখানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে কি বলবে— ডুমা নেই? এত লোক যে মারা যাচ্ছে— তারা কি হচ্ছে?

এলিয়ো বলল— "এ সব আমাদের ধর্মে নেই।" রাম নায়ক উত্তর দিল— "তোমাদের ধর্মের বেশী বয়স না আমাদের ধর্মের?— যে সে সব জানবে? আমি এই পাহাড়ের সমবয়সী। আমি মারা যাবার পর আমার দিদিমার জন্ম হল। আমার দিদিমার ভাই মারা গেলে, তার ডুমা আবার আমি হয়ে জন্ম নিলাম। আবার আমি যখন মারা যাব, আমার ডুমা আবার ছেলে হয়ে জন্মাবে। যতক্ষণ না মানুষ হয়ে জন্ম নিচ্ছি, ডুমা হয়েই থাকব। ডংগরে ডংগরে বেড়াতে থাকব। আগুন লাগাব, বাতাস হয়ে গির্লিগাছের ফুল ঝরাব, মেঘ হয়ে ডংগরের গাছে জল দেব, অন্ধকার হয়ে তারা ফোটাব। আমি সব জানি, তুই কিছুই জানিস না।"

এলিয়ো বলল— "আরে তুই শুধু এমনি বলবি? শাস্ত্র পড়বি না? পাস্টর কত ছাপানো বই পড়ে আমাদের শোনায়— তাতে কত কি লেখা আছে।"

রাম নায়ক বাধা দিয়ে বলল—"সেদিন পাস্টর একটা নতুন বই এনেছিল— সেটা নতুন কাপড়ের মতো পরিষ্কার দেখতে। আর আমাদের *দিশাবির* ঘরে পুঁথি দেখিস— তালপাতার পুঁথি। কত কি লেখা আছে— আবহাওয়ার কথা, নানারকম ভালমন্দের কথা, কে কার ডুমা তার কথা। সেই পুঁথি, এই পাহাড় ও অন্ধকারের মতো অনেক পুরনো— আর তোমাদেরটা নতুন।"

এলিয়ো প্রাচীন বলল— "আচ্ছা ভাই আচ্ছা, তোমার ধর্ম তোমার কাছে থাক্, আমারটা আমার কাছে। এত কথা কেন?"

চাঞ্চেরী ডোম বলল— "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা।"

তারপর কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ এগুতে লাগল। ক্রমশ গ্রামের আলো কাছে এল। রাতে বাচ্চারা যে যার বাড়ির সামনে আগুন জ্বেলে বসে থাকে। কখনো, কখনো, তারা সেই আগুনে ভুট্টা বা ছাগলের চামড়া পুড়িয়ে খায়। দূর থেকে এই

ডংগর— জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়

দিশারি—পুরোহিত

আলো দেখা যায়। বুড়িমার নোংরা আঁচলের মতো গ্রামের গন্ধ, গ্রামের ধুলো আর গ গ্রামের ধোঁয়া, জঙ্গলের দূরের পথিক মনে আশ্বাস এনে দেয়।

গ্রাম আরো কাছে এল।

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে, গাছের পাতা ঝরিয়ে বড় বাঘের গর্জন শোনা গেল। ডাকের উপর ডাক। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড় অবধি বুক কাঁপিয়ে রক্ত জল করে বাঘের গর্জন ঘড় ঘড় করে গড়িয়ে গেল। ক্লান্ত পথিক পাঁচজন গ্রামের সীমানায় *ঝারি* গাছের নিচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এলিয়ো বলল— "ওই পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে— বড় বাঘ।"

হরি জানি সঙ্গে সঙ্গে বলল— "বাঘ নয়, বাঘের ডুমা।" রাম নায়ক বলল— "কত লোককে তো বাঘ ধরে খাচ্ছে— কার ডুমা ডাকছে কে জানে?" চাঞ্চেরী ডোম বলল— "বাঘই হোক বা বাঘের ডুমাই হোক— আমার বড্ড ভয় করছে।"

আবার পাঁচ বন্ধুতে এগিয়ে চলল। গ্রাম থেকে কেউ হাঁক দিল—"কে যায় রে।"

এরপর বাড়ি এসে গেল।

২

তার পরের দিন রাম নায়ক পঞ্চায়েত ডাকল।

একটি ঝাঁকড়া বটগাছের নিচে গ্রামের সদর রাস্তার চারিধারে অসংখ্য ছুঁচোল পাথর ছড়ানো রয়েছে। গ্রামের যত পুরুষ মারা যায়, প্রত্যেকের স্মৃতির উদ্দেশে একটি করে ছুঁচোল পাথর, ও যত স্ত্রীলোক মারা যায়, তাদের নামে একটি করে চ্যাপ্টা পাথর পোঁতা হয়। তারই মাঝখান দিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি সকলের বসবার জন্যে বেশকিছু পাথর রাখা আছে। ওখানে কখনো পঞ্চায়েতের সভা ডাকা হয় বা কোন কোন রাতে গ্রামের *ধাংড়ী*দের নাচ দেখা হয়।

দিশারি বুড়ো মধ্যিখানে বসল। লন্ধা মদ খেয়ে ওর চোখ যেমন ঘোলাটে ঠোঁট তেমনি ফুলো ফুলো। ওর কাছে রাখা আছে একটি থলে, তার ভিতরে কি আছে দেখার জন্যে শিশুর দল বাবা-মার পিছন থেকে উঁকি মারে। এ ছাড়া আছে একখানা তেল চুক চুকে তালপাতার পুঁথি, নানা রং-এর আলপনা দেওয়ার মাটি, ভলিয়া ফল, মন্ত্রপূত হাড়, প্রদীপ ও সল্‌তে, চকখড়ি, নক্সা করা কাঠের বর্শা, ভল্ল ও তলোয়ার। গ্রামের সকলে এসে জড়ো হল। সকলে গম্ভীর হয়ে বসে আছে— কারুর মুখে একটিও কথা নেই।

ঝারি— একপ্রকার গাছ

ধাংড়ী— বিবাহযোগ্যা কিশোরী

রাম নায়ক প্রথমে কথা শুরু করল— "দিশারি বুড়ো, তুমি এবার বল।" তখন দিশারি জানাল—"সঠিক মুহূর্ত এসেছে, গুরুমাঈ এবার উঠুক।"

শ্যাম গুরুমাঈ আস্তে আস্তে উঠে দিশারির কাছে গেল। যদিও সে পুরুষ মানুষ, তার মাথায় কিন্তু লম্বা চুল, নাকে নোলক পরা ও মেয়েদের মতো শাড়িপরা। গ্রামের সকলকে বলে সে পুরুষ নয়— স্ত্রীও নয়। তাই তার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে। ও ছাড়া অন্য কারোর উপর দেবী বর করবেন না তাই সে গুরুমাঈ। প্রতিটি গ্রামে একজন করে গুরুমাঈ থাকে। কোন না কোন কারণে এদের বাবা মা-রা ছোটবেলায় এদের দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে থাকেন। তারাই গুরুমাঈ। তারা দেবভাবাপন্ন। অন্য সময়ে তার যাই হোক না কেন পূজার সময় তারা নারী।

শ্যাম গুরুমাঈ গিয়ে দিশারির কাছে দাঁড়াল। তখন দিশারি আলপনা দিয়ে সলতেতে আগুন ধরাল। অবিবাহিত একটি ছেলে আগুন জ্বেলে দুটি ভাত রান্না করে দিল। একটি পাতার ঠোঙায় ভাত রেখে, তার উপরে ভালিয়া ফল ছড়িয়ে দিল। দিশারি জ্বলন্ত প্রদীপটি গুরুমাঈর মাথায় ঠেকিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কতকিছু মন্ত্র আওড়াতে লাগল। রাস্তার একধার থেকে ডোমেদের বাজনা বেজে উঠল। দিশারি তখন কাঠের তলোয়ার ও ভল্ল গুরুমাঈর হাতে তুলে দিল। গুরুমাঈর উপর তখন দেবী ভর করলেন।

তারপর একঘণ্টা ধরে বাজনা বাজল ও সারা গ্রাম জুড়ে রোদের মধ্যে গুরুমাঈর নাচ চলল। গুরুমাঈর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অনেক মেয়ে এলোচুলে নেচে নেচে এগুতে থাকল। রাস্তার মোড়ে অনেক মুরগী ও পায়রা বলি দেওয়া হল। ধুলো উড়িয়ে গুরুমাঈ নাচতে থাকল। শ্যাম গুরুমাঈ ভালই নাচে। যতই বুকের পাটা থাক না কেন এই নাচ দেখলে সবাই ভয়ে কুঁকড়ে যায়।

গুরুমাঈ চিৎকার করে বলল— "কাল রাতের প্রথম প্রহরে কত ডাক দিলাম। আগেও ক'বার দিয়েছি। তোমরা কেউ শুনছো না। তিনবার বলছি— খাব, খাব, খাব।"

গ্রামের বাচ্চা বুড়ো সকলে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে দিশারি বুড়ো দুলে দুলে একটি মাটির পাত্র থেকে একটু একটু লন্ধা মদ খাচ্ছিল। গুরুমাঈর মুখের কথা বেরোতে না বেরোতে সকলে বাতাসে নুয়ে পড়া জোয়ার ক্ষেতের মতো মাথা নিচু করে, হাতে মুখ ঢেকে "হায় হায়" করতে লাগল। গুরুমাঈ আবার বলল— "খাব, খাব, খাব।"

লোকের আরো ঝুঁকে পড়ল।

শেষে দেড়শো মানুষ মুখ গুঁজে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে করুণ গলায় চিৎকার করতে থাকল— " হায়, হায়, হায়।"

গুরুমাঈ বলল— "আমি দাদিবুঢ়া। তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করেছি। কিন্তু

তোমরা আমায় মানছ না। প্রতিগ্রামে 'দাদিবুঢ়া'র পূজা হয়, কিন্তু এ গ্রামে হয় না। তোমরা আমাকে মুরগী দিলে না, পায়র দিলে না, ছাগল দিলে না, জল দিলে না। খিদে তেষ্টায় আধমরা হয়ে আমি ডংগরে ডংগরে ঘুরে মরছি। শেষ হুকুম দিচ্ছি— আর তিনদিন দেখব তারপরে 'খাব, খাব, খাব'।''

তিনদিন সময় পাওয়া গেছে শুনে গ্রামের লোকেরা যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেল। থেমে আসা ঢোলক আবার জোরে জোরে বাজতে থাকল। রাস্তা কাঁপতে শুরু করল। বাজনার তালে তালে গ্রামের ধনী দরিদ্র সবাই নাচতে শুরু করল। পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। পায়রা-মুরগীরা সব গলাকাটা হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকল। দাদিবুঢ়ার মুখে পিচ্‌কারী দিয়ে রক্ত মাখানো হল। দাদিবুঢ়ার পূজা সারা হল।

তারপরে একদৌড়ে গুরুমাঈ গ্রামের ওপরদিকে গিয়ে পৌঁছাল। গ্রামের সধবারা নেচে নেচে তার পিছনে দৌড়তে থাকল। মাঝখানে একটা ছোট্ট পাহাড় চূড়া— গুরুমাঈ একলাফে তার উপরে উঠে গেল— পিছনে পিছনে বাজনদাররা ও নাচের দল। এক দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠে বুড়ো খেজুর গাছটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে গুরুমাঈ জ্ঞান হারাল। পূজা শেষ হল।

দিশারি বুড়ো খেজুর গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল— ''উত্তর পাওয়া গেছে। আজ এইখানে 'দাদিবুঢ়া' তাকল। সকলে পুজো দিও। ভুলে যেয়ো না যেন।''

দম্ দম্ করে গ্রামের সব জানা আবার বেজে উঠল। সকলে নাচতে শুরু করে দিল। *ধাংড়ারা* শিস্ দিতে দিতে নাচল। ধাংড়ীরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচল। বুড়োবুড়ি সকলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। দেড়শ লোকের সরল হৃদয়ের ঐক্য বিশ্বাসে খেজুর গাছেই 'দাদিবুঢ়ার' প্রতিষ্ঠা হল।

দিশারি মন্ত্র আওড়াতে লাগল, পাঁজি ওল্টাতে থাকল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়্ বিড়্ করে কতকিছু বলতে থাকল। মাটিতে আলপনা দিয়ে, তার এক কোণে একটি কাঠি পুঁতে রেখে, তারই ছায়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। লাউখোলার পাত্র থেকে একফোঁটা লান্ধামদ খেল। তারপরে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— ''কাটো, কাটো, গাছের মাথা কেটে ফেল, না হলে 'দাদিবুঢ়া' এখান থেকে পালিয়ে যাবে।''

গোড়া থেকে এক মানুষ উঁচুতে একসঙ্গে দশখানা কুড়ুল গাছের উপর পড়ল। যতটুকু দাঁড়িয়ে রইল, ততটুকুই হল ''দাদিবুঢ়ার'' প্রতীক। মাথা থেকে গোড়া অব্দি গাছের গুঁড়ির গায়ে কুড়ি একুশবার কোপ মেরে সাত খাঁজ করা হল। কাটা ঘায়ে চুন-হলুদ লাগানোর মতো গুঁড়ির সেই কাটা জায়গাগুলিতে সাদা, লাল, কালো রং মাখিয়ে, মাথায় পরিষ্কার সাদা এক টুকরো কাপড় পাগড়ি করে বেঁধে দেওয়া হল।

ধাংড়া— বিবাহযোগ্য কিশোর

''দাদিবুঢ়া'' মুরুব্বি হয়ে প্রহরীর মতো বড় চোখ মেলে নিচে গ্রামের দিকে তাকিয়ে রইল।

চারদিকের গোল হয়ে ঘিরে থাকা পাহাড়ের মধ্যিখানে গভীর খাদ— তার ভিতরে অগুনতি পাথরের মধ্যে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে কাস্তে ফলার মতো মুরান নদী। নদীর ধারে ধারে ছোট রঙ টিপির ঢালুতে গ্রামের বস্তি— একটি ছোট টিপির ওপরে চাতালে খেজুর গাছের ঠুঁটো গুড়ি— সেই হল ''দাদিবুঢ়া''।

কোরাপুটের জংলীলোকেরা 'দাদি' বলতে বাবার ছোট ভাইকে বোঝায় না। তারা বোঝায় বাবার বাবা ও তার বাবা। যেমন ওর শ্বশুর বলতে বোঝায় স্ত্রীর ভাইকে। আর দাদির সঙ্গে বুঢ়া জুড়ে দিলে পরজা ও কন্ধ দুই ভাই ভাষাই মিশে যায়। কন্ধ ভাষায় বুঢ়া অর্থ বাবার বাবা।

এইভাবে সাতখাঁজকাটা ''দাদিবুঢ়া'' টিপির উপর দাঁড়িয়ে থেকে কাঠের চোখে জুল্ জুল্ করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তাকিয়ে তাকিয়ে দিন যায়, রাত আসে। পাহাড়ের ঢাল বিস্ময়ের অন্ধকারে ভরে যায়।

''দাদিবুঢ়া'' অতি শান্ত ঠাকুর। খুব বিরক্ত না করলে তিনি রাগ করেন না। তিনিই তো সেই অনাদি পূর্বপুরুষ। এ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি— তাঁর খেলা। ''দাদিবুঢ়া'' মুখ খুলতে পারেন না, তাই যে যা বলে সেটাই তাঁর কথা।

টিপির উপর থেকে নিচের ক্ষেতগুলি বড় সুন্দর দেখায়। সারি সারি বেড়ার মাঝে চৌকো চৌকো ক্ষেত। গমের গাঢ় সবুজ, জোয়ারের কালচে সবুজ, ধানের হাল্কা সবুজ। ক্ষেতগুলির পাশে সবজির বাগান। সেগুলিও সরু সরু ডালের বুনটে বাঁধা ঘন বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভিতরে ভুট্টার লম্বা দাড়ি হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে দোলে। ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, কুঁদরী দুলে দুলে বড় হচ্ছে। ''দাদিবুঢ়া'' ক্ষেত বাগান সব পাহারা দেয়। দেখে তার ছেলে ও নাতিপুতিরা শুকনো মাটি থেকে কত সবুজ ফসল তুলছে। আবার কিছুক্ষণ ''দাদিবুঢ়া''র ঝিমুনি আসে, তখন কাকেরা ভুট্টা ছিঁড়ে নষ্ট করে, ক্ষেতের মধ্যে গরু ঢোকে।

গ্রামের সব লীলা খেলা ওর পথের ধারে চলে। দিন দুপুরে গ্রামের পরণের কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুরান নদীর ঘাটে জলে নেমে দাপাদাপি করে। গরুদের ছেড়ে দিয়ে বটগাছের তলায় রাখাল ছেলের বাঁশির সুর তোলে। সন্ধে হতে না হতেই গরু-মহিষের দল পাহাড়ের আনাচ-কানচ থেকে সার বেঁধে ঢালু গ্রামের দিকে ফিরে আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল ফলবাগানের ডালপালার মধ্যে হারিয়ে যায়। দিন শেষ হয়। নিচু চালা থেকে ধোঁয়া ওঠে। ধাংড়াদের ঘরে ডুংডুঙ্গা বাজতে শুরু করে। রাতের অন্ধকারে গানের মাধ্যমে ছোকরা-ছুকরিদের খেলা শুরু হয়। ''দাদিবুঢ়া'' নিশ্চল হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রতি শুক্রবার নলিগাঁহাটে ''দাদিবুঢ়া''র রাস্তা ধরে ছাতা মাথায় অসংখ্য মানুষের

স্রোত বয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি। হাটে যাওয়া যেন ওদের পরব। এক পয়সার তামাক কিনবে বা আধলা দিয়ে নুন কেনার ছুতোয় গ্রামের অর্ধেক পুরুষ ও প্রায় সব মহিলারা আট-দশ ক্রোশ পথ হেঁটে আসে।

পরজা ও ডোম মেয়েরা মাথায় রেড়ির তেল মেখে খোঁপা বেঁধে, তাতে সাদা ফুলের থোকা গোঁজে। লাল শাড়ি পরে হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে তারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলে। একবারের জন্যেও ওরা হোঁচট খায় না। ওদের পাও ব্যথা করে না। খ্রীষ্টানরা আসে পরিষ্কার কাপড় ও এক একটা ব্লাউজ পরে, নয়তো রঙ্গীন কাপড় যার একদিক লাল তো অন্যদিক নীল বা হলদে, আর চলে 'গহবা' মেয়েরা— এদের গায়ে হাতে বোনা চটের কেরং কাপড়— লাল কালো ডোরাকাটা। কানে গোল গোল পেতলের তারমোড়া অলংকার— কাঁধ অব্দি নেমে এসেছে— মাথার চুলে লাল পট্টি বাঁধা। সকলেরই একরকম সাজ।

ওদিকে পাহাড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ কখনো মানুষের দল থমকে দাঁড়ায়। দাদিবুঢ়ার দিকে আঙুল তুলে তারা বলে— "ওই দেখো দাদিবুঢ়া।" কখনো কদাচিৎ কেউ ফলটা বা ফুলটা নিয়ে দাদিবুঢ়ার পায়ের তলায় রেখে অসে। প্রণাম অবশ্য প্রচুর পাওয়া যায়। দাদিবুঢ়া তাকিয়ে তাকিয়ে হাত পা নাড়তে পারা মানুষের কাণ্ডকারখানা ও অঙ্গভঙ্গী দেখে। চুপচাপ্ শুধু দেখে, কিছু বলে না— কারণ তার মুখ নেই— সে ঠাকুর।

এইভাবে সারাদিন দাদিবুঢ়া টাক মাথায় পাগড়ি বেঁধে বৈশাখের প্রচণ্ড তাপ জ্যৈষ্ঠের অবিরাম ধারা সবই সহ্য করে। তখন ক্ষেতে চাষীর দল গান ধরে।

জেঠ্ হাণু মারুলি
বর্ষা দুলি আসুলি।।

কার্তিকের হাড় কাঁপানো শীতের হাওয়া সহ্য করে রাতের তারায় ভরা আকাশের মতো নির্বাক ও অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কোনরকম অনুভূতি বা হৃদয় নেই। এর কারণ সে দেবতা— সে ঠাকুর। সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে ও চোখ মেলে সব কিছু দেখে।

কয়েকদিন পরে দাদিবুঢ়ার খুব কাছে তৈরি হল একটি উইহুঁকো। দিনদিন সেটা এত বিরাটা আকার ধারণ করল যে মনে হল দাদিবুঢ়াকে ও আকারে ছাড়িয়ে যাবে বুঝি। দিশারি পাঁজি উল্টে গ্রামের লোকেদের বোঝাল দাদিবুঢ়া সঙ্গী পাবার জন্যে কোন এক দেবতার ডুমাকে নিজের কাছে ডেকে এনেছে। তাই তারা কেউই উইহুঁকো ভেঙে দিল না। তারপ থেকে "টুয়াটুঁইর" মতো দাদিবঢ়া ও হুঁকোবুড়ো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

দাদিবুঢ়ার কাছে মানত করার সময় যাদের সন্তানাদি হচ্ছে না, বা ভাত হজম

হচ্ছে না বা রোগ সারছে না, তার হুঁকোবুড়ের গা থেকে মাটি নিয়ে খেত। এইভাবে প্রতিদিনের সংসার যাত্রা এগিয়ে চলে।

৩

রাম নায়কের একটি মাত্র ছেলে— ঠেঙ্গাজানি। বাবার পরে সে যে গ্রামের নায়ক হবে এতে কারুর কোনোদিন সন্দেহ ছিল না। তখন রাজবাড়ি থেকে তার জন্যে মাথার পাগড়ি ও পোশাকে লাগাবার জন্যে দুটি বোতাম আসবে। একটির উপর রাজার ছবি— অন্যটির উপর রাজার নাতির ছবি থাকবে। আমিন রিবিন্যু খুশি থাকলে ওর নায়কের পদে নিযুক্তি কেউ আটকাতে পারবে না কাজেই তার বড়ই খাতির।

ঠেঙ্গাজানি দিনের বেলায় বাবার ক্ষেতে চাষবাস দেখে। আর সন্ধে হতেই ছোটে ধাংড়াঘরে। সেখানে গ্রামের আরো দশ-বারোজন অবিবাহিত ছেলে রাতে শুতে আসে। রাস্তার একদিকে ধাংড়াদের থাকার ঘর— উল্টোদিকে ধাংড়ীঘর। সেখানে রাতে গ্রামের বিবাহযোগ্যা মেয়েরা ঘুমোতে আসে। সন্ধে থেকে ধাংড়াঘরে ছেলেরা ডুংডুঙ্গা যন্ত্র বাজিয়ে গান শুরু করে। এজেন্সির সর্বত্র এই ডুংডুঙ্গা পাওয়া যায়। একটি শুকনো আধখানা লাউয়ের খোলের উপর চামড়া টান করে লাগানো থাকে। তার সঙ্গে রয়েছে একটি কাঠের হাতল। এই হাতলের উপর এদিক থেকে ওদিক পেরেক পুঁতে, তার মধ্যে দিয়ে তার টানা হয়। অন্যদিকে লাউয়ের গায়ে একটি মাটির খাপরা তারের ভার টেনে রাখে। ওই তারের গায়ে টং টং করলে ডুং ডুং শব্দ হয়। একহাতে ডুং ডুং করে অন্যহাতের আংটিপরা আঙুলে লাউয়ের পিঠে ঠক্ ঠক্ করে তাল রাখা হয়। সন্ধে হতেই ঠেঙ্গাজানির ডুংডুঙ্গার বাজনা মশার ভোঁ ভোঁ আওয়াজকেও ছাড়িয়ে যায়। তার পরে সে গান ধরে।

ওপার থেকে হরিজানির মেয়ে— সারিয়াদান, কথা সাজিয়ে সাজিয়ে গানে গানে উত্তর দেয়। তখন গানে গানে লড়াই চলে। ঠেঙ্গার বন্ধু পুরুণামণ্ডিয়া ও পোঢবন্ধু ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরে। ওদিকে সব কিশোরীরা তখন একসঙ্গে মিলে যায়। প্রীতির ঢেউ তখন জঙ্গলে জঙ্গলে খেলে বেড়ায়।

রাম নায়ক এলিয়োকে জিজ্ঞেসা করে— "শুনেছো প্রাচীন, ঠেঙ্গার জন্যে সারিয়াদানকে চাইলে খারাপ হবে?"

প্রাচীন বলে— "নায়ক, ভাল হবে, খুব ভাল হবে। গ্রামে তুই ছাড়া জানির সঙ্গে সমান হতে আর কেইবা আছে?"

তখন নায়ক বলে— "থাক্, থাক্, আর কটা দিন যাক্। ঠেঙ্গা এখনও ছোটই আছে। দেখি সে নিজে নিজে কি ঠিক করছে।"

গ্রামের সব মেয়েরা ঠেঙ্গাজানিকে আক্রমণ করে। নায়কের বউ হতে কার না মন চায়? ঠেঙ্গাজানি গান ধরলে মাঝে মধ্যে এদিক থেকে ওপর পড়া হয়ে চম্পাবতী বা সুঁয়াপুল বা আর কেউ গানের উত্তর দিয়ে দেয়। সারিয়াদানকে ধরে হেসে গড়াগড়ি খায়। এখান ওখান থেকে গাওয়া ঠাট্টায় ভরা কত গানের ঢেউ এসে ঠেঙ্গার মনে লাগে। তাতে তার মন টলমল করে ওঠে। নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। পরে নির্জনে গ্রামের ঘাট পেরিয়ে ক্ষেতে যাবার পথে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে কাকে সে পছন্দ করবে? কারুর মায়া সে এড়াতে পারে না। আবার দশ জনের ভিতর থেকে কোন একজনকে সে বেছে নিতে পারে না।

পূর্ণিমা রাতে গ্রামে বড় রাস্তায় "কাঠ গণ্ডিরা" আগুনের নাচ হয়। সব মেয়েরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়। ওদিকে ওইভাবে ঠেঙ্গাজানি আরো তিনজন ছেলের সঙ্গে দাঁড়ায়। ওদের কাঁধের উপর আরো চারজন জোয়ান ছেলে উঠে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় আটজন ছেলে নাচতে থাকে। নিচের সারির ছেলেদের হাতের তল দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে মেয়ের দল বাজনার তালে তালে নেচে নেচে বেরিয়ে যায়। গ্রামের কোন কোন মেয়ে নেচে নেচে এগুবার সময় ঠেঙ্গাজানির কাছে যেন একটু বেশি সময় দেয়। কেউবা ঠেলা দেয়। তখন ঠেঙ্গাজানির মনে হয় নাচটাচ সব ফেলে রেখে কোন একজন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দাদিবুড়ার টিপির উপর চলে যায়। তার বয়স অল্প। মনের মধ্যে স্বপ্ন এসে যায়। সে কিছুই করতে পারে না। একজনের কথা ভাবলে অন্যজনের চিন্তা মনে ছায়া ফেলে। ঠেঙ্গাজানি দোনমনো করে।

হলুদমাখা তেল চুকচুকে শরীর— অল্পরোদের তাতে গলান মাখনের মতো গলে গলে পড়ে। চোখের চাহনি যেমনি গভীর তেমনি সুন্দর (পরিপাটি করে বাঁধা উবু ঝুঁটিতে ছোট ফুলের থোকা)। গায়ে সকালের সূর্যের রক্তিম রঙের শাড়ি আঁটো করে পরা। স্বাস্থ্য আর যৌবনের প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ে। হরিণীর মতো তাদের গতি ক্ষিপ্র ও উল্লাসময়। এরাই হল সুঠাম সুন্দর ধাংড়ীর দল। হলুদ রঙের *অলসি* ক্ষেত ও নীল্‌চে সবুজ জোয়ার ক্ষেতের উপর সরল হাসির মায়া কুয়াশার মতো বিছিয়ে দিয়ে ঠেঙ্গাজানির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধাংড়ীর দল। ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মন ঘোলাটে হয়ে যায়। হৃদয়ের গহন অনুভূতির মধ্যে ফুল ও কাঁটা দুই ঢোকে পাশাপাশি। দাদিবুড়া সব মায়া কাটিয়ে সাতখাঁজকাটা খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কিছু বোধ হয় না। আনন্দ হয় না দুঃখও হয় না। কিন্তু ঠেঙ্গাজানি বিদ্ধ হয়। ওর শরীর ও মনে জ্বালা ধরে। সব কিছু বুঝতে পারলেও আলাদা করে কেউ একজন গোপনে তার মনে ছায়াপাত করে না। কাজেই সে হাসে, খেলে বেড়ায় লাফায় কিন্তু শেষকালে

অলসি— একপ্রকারের তৈলবীজ

থমকে যায়। এগুতে আর পারে না। মেয়েরা ওকে ঠাট্টা করতে ভালবাসে। কারণ নারীপুরুষের সম্পর্কে সে বেশিদূর এগুতে পারেনি। যদিও তার বলিষ্ঠ গড়ন, সুন্দর চেহারা আর চোখদুটি যেন মেঘের রাজ্যে ভেসে খেলা করতে করতে স্বপ্নালু হয়ে ওঠে, তাকে বাস্তব করার চেষ্টা সে কোনোদিনই করেনি। কিন্তু এখনো সে অজেয়। তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক অনুযায়ী তাকে আক্রমণ করতে হবে, ভেঙে দিতে হবে, আঘাত করতে হবে যতক্ষণ না সে ভেঙে পড়ছে।

ধাংড়ীঘর থেকে ভেসে আসা রণদুন্দুভির মতো গানের জবারে ঠেঙ্গাজানি বাপঠাকুর্দার আমলের গান গেয়ে উত্তর দেয়।

সারিয়াগারু কাতিকাড়ু শুণ্ডিগারু হিণ্ডা
আইলুসরে টোকি দুই কেতে রিসিভিণ্ডা॥

দুন্দুভি বাজিয়ে যেন ডাকে কত তোমার যৌবনের শক্তি এসো পরখ করে যাও। সব বন্ধুরা ওর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেয়। গানের উত্তর আসে তবুও ঠেঙ্গাজানি রাস্তার ওধারে যেতে পারে না। ধাংড়া ঘরে শুয়ে থেকে ছটফট করে ও হাত পা আছড়ায়। ওপারে যেতে ওর পা ওঠে না। টিপির উপরে পাগড়ি মাথায় দাদিবুড়া মানুষের মর্মের ব্যথা কত যে বোঝে— একা সেই জানে...

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের পথে সারিয়াদান কিছু ভুট্টা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এক পাল গরু নিয়ে অন্যদিক থেকে ঠেঙ্গাজানি আসছিল। পথের মধ্যে দুজনের দেখা। ঠেঙ্গাজানি হাসতে হাসতে বলল— "কইগো, একটা দিবি নাকি?" সারিয়াদান হেসে হেসে একটি ভুট্টা বাড়িয়ে দিল। ঠেঙ্গা চট্‌ করে ওর একটি হাত ধরে ঠেলে আস্তে করে একটু নেড়ে টিপে দিল— এবং হঠাৎই হাতটি ছেড়ে দিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে চলে গেল। ভুট্টা আর নেওয়া হল না।

আবার আর একদিন ভরদুপুর বেলায় সমরা পরজার মেয়ে কম্‌লি এক কলসী জল নিয়ে শুঁড়িপথ বেয়ে ওপরে উঠছিল। ঠেঙ্গা কাঁধে একটি বাঁশের ডগায় দুতিনটি লাউ ঝুলিয়ে ক্ষেতের দিকে যচ্ছিল। কম্‌লির পা পিছলে গেল। সে এমনভাবে বসে পড়ল যে কলসী ভাঙল না, কিন্তু সব জলটুকু গড়িয়ে গেল। আর তার পা মট্‌কে গেল। ঠেঙ্গা কাছ দিয়ে যাবার সময় কম্‌লি যন্ত্রণায় উঃ, আঃ করছিল। কলসীটি নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাঁধের ভারা নামিয়ে রেখে ঠেঙ্গা কম্‌লিকে তুলে ধরল। কম্‌লির শরীর বেঁকে যাচ্ছিল। চারিদিকে গাছের ছায়া। এদিকে ওদিকে খাদের খাড়াই। তার ভিতর দিয়ে ক্ষেতে যাবার রাস্তা। খাদের মধ্যে তখন কেউ কোথাও নেই। নির্জনে একটি ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠেঙ্গা মুহূর্তের জন্যে কম্‌লির করুণ মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করে নিজের মুখখানি ওর মুখের ওপর নামিয়ে আনল ঠিকই কিন্তু পরমুহূর্তে কম্‌লিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজের পথ ধরল। উত্তেজনা চাপা দিতে সে দুম্‌দাম্‌ পা ফেলে এগিয়ে গেল।

ছোটবেলা থেকে গ্রামের মেয়েদের দেখে আসছে। কত মেয়ে তার সামনে ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াত। ছোটবেলা থেকে তাদের সঙ্গেই ও বড় হয়ে উঠেছে। আজকাল তাদের দেখলে হঠাৎ চমক লাগে। মনের মধ্যে আনচান করে। আবার সে সোজা পথ ধরে এগিয়ে যায়।

টিপির উপরে দাদিবুঢ়া দাঁড়িয়েই থাকে। রাম নায়ক প্রতিদিন এসে তার পায়ের তলায় প্রণাম করে, প্রার্থনা জানায়— "দাদিবুঢ়া,— আমার ঠেঙ্গার জন্যে একটি ভাল বউ ঠিক করে দিবি। সে যেন সুন্দরী হয়, ক্ষেত খামারের কাজে শক্ত সমর্থ হয়, অনেক সন্তানের জননী হতে পারে ও আমাদের বুড়োবুড়ীদের সেবা করে।"

নির্জন সন্ধ্যায় যখন দাদিবুঢ়া ও হুঁকাবুঢ়ার চারিধার অন্ধকারে ভরে যায়— নিচের ধাংড়াঘর থেকে ডুংডুঙ্গার যমক অনুপ্রাস মশার ভোঁ ভোঁ আওয়াজ বলে মনে হয়, রাম নায়ক বারবার দাদিবুঢ়ার সামনে মাথা খুঁড়ে নিবেদন জানায় নিজের কথা নিজেই শোনে— "গত বছর আমার পাঁচ-পাঁচটি গরু মারা গেছে, এ বছর যেন তা না হয়— তোকে পায়রা, মুরগী, সব সব দেব। দাদিবুঢ়া! ও রকমটি যেন আর করিস্ না— আমি তবে মারা পড়ব।"

মাঝে মধ্যে হরিজানি আসে। সেও বলে— "দাদিবুঢ়া, আমার সারিয়াদানের জন্যে রাম নায়কের ছেলে ঠেঙ্গাকে ঠিক করে দে। তোকে পুজো দিয়ে না হয় একটা বুড়ো গরু দেব ও এক টিন রান্না করা মদ দেব।"

এইভাবে দাদিবুঢ়ার কাছে সকলেই পুজো দেয়। আর হুঁকোবুঢ়া দিন দিন আকারে বাড়তে থাকে।

কখনো সখনো গ্রামের মেয়েরে ভর দুপুর বেলায় এক একছড়া মালা গেঁথে নিয়ে আসে। দাদিবুঢ়াকে ঘিরে গোল হয়ে হাতে হাত ধরাধরি করে নাচে আর গান গায়।

আমুগাণু জামুগাণু বিতুরে
খড়ুমাসা মড়িমাসা গীতুরে।

তারপর দাদিবুঢ়ার কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে চুপি চুপি কারুর নাম উচ্চারণ করে ফুলের মালাগুলি সব ওর গলায় ঝুলিয়ে দেয়। তারপর নিজেদের মধ্যে হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি করে পরস্পরকে চিমটি কেটে দল ভেঙে দৌড়ে পালায়।

দাদিবুঢ়ার কাছে মানত করে কেউ কোনোদিন হতাশ হয় না। সকলে আশা নিয়ে অপেক্ষা করে কোনো না কোনো একদিন ওদের মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। দাদিবুঢ়া কখনো ফাঁকি দেবে না।

এইভাবে দাদিবুঢ়ার কাছে অনেক মুরগী বলি পড়ে, মদ ঢালা হয় ও ফুল জমা হয়ে শুকিয়ে যায়।

মাঝরাতে তিনচারজন লোক সেখানে আসে। মুখে তাদের ঘন দাঁড়িগোঁফ, কালো শরীর রেড়ির তেল মেখে চকচক করছে। একটি করে কালো কৌপিন পরা— এরা

জাতিতে ডোম বা কেরি। এদের খোঁজে পুলিশ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে। তারাও দাদিবুঢ়ার কাছে মিনতি করে— "পুলিশের লোক যেন আজ গ্রামে আমাদের খোঁজে না আসে। ইনসিফিটি বাবু যেন জ্বরজারিতে ভোগে। এই যে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়কে উপেক্ষা করে আমরা গভীর রাতে আমাদের কাজে যাচ্ছি, আমরা ধরা যেন না পড়ি ঠাকুর— কিছু যেন পাই, খালি হাতে ফিরতে না হয়। আমাদের ভালমন্দ শোনাবার লোক একমাত্র তুই। তুই ছাড়া আর কেইবা আমাদের দুঃখ বুঝবে?"

লম্বা হয়ে শুয়ে দাদিবুঢ়ার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মনে নতুন আশা নিয়ে ও বুকে সাহস বেঁধে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

নদীর ঘাটে বন্ধু সারিয়াফুলের গলা পরিষ্কার করতে করতে সারিয়াদন অতি গোপনে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল যে সে আড়াল থেকে শুনেছে যে তার বাবা তার মাকে বলছিল, "নায়ক, যদি তার ছেলের জন্যে মাত্র দুকুড়ি টাকা পণ দিয়ে মেয়েকে চাইতে আসে তাতে সে রাজি হবে। 'না' বলবে না।" এই বলে হাসতে হাসতে সারিয়াদা জলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলল। সারিয়াফুলও সঙ্গে সঙ্গে বলল— ওর বাবাও একই বিষয়ে ওর মামার সঙ্গে কথা বলছিল। মামা নায়ককে গিয়ে বলতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই বলে হাসতে হাসতে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল বটে কিন্তু সেই হাসির মধ্যে হিংসের আগুনের ঝিলিক ছিল।

তারপর দুজনে হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে দুই লাঠি বেলা হয়ে গেছে, আর কতক্ষণ চান হবে বলে দু'জনে জল থেকে উঠে পরণের কাপড় দুটো টেনে নিয়ে, গায়ে জড়িয়ে, যে যার রাস্তায় বাড়ি ফিরে গেল।

সেদিন ভর দুপুর বেলায় সারিয়াদন গেল দাদিবুঢ়ার টিপির দিকে। তখন সারিয়াফুল টিপির উপর থেকে নামছিল। সারিয়াদান ওকে জিজ্ঞেস করল— "কোথায় গিয়েছিলি?" ফুল উত্তর দিল— "আমাদের মাদী শুয়োরটা কোথায় যে হারিয়ে গেছে, তারই খোঁজে ওই দিকে গেছিলাম। তুই কোথায় যাচ্ছিস্?"

"আমি যাচ্ছি পায়খানা করতে— এদিকে অনেক লোকের ভিড়।"

দুই সখী পরস্পরের দিকে বুক ফুলিয়ে তাকাল এবং পিছন ঘুরিয়ে যে যার পথে এগুল।

টিপির উপরে পৌঁছে সারিয়াদান দেখল দাদিবুঢ়ার পাগড়ির ওপরে একছড়া টাট্‌কা ফুলের মালা ঝুলছে। একটানে সেটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের আঁচল থেকে রঙীন জবাফুলের মালা বার করে সেখানে ঝুলিয়ে দিল। দুহাতে দাদিবুঢ়াকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুপিচুপি বলল— "দাদিবুঢ়া তুই শুধু আমার দেওয়া মালা পরবি। অন্য কারুর ফুল ছুঁবি না। নিলে আমি রাগ করব, অন্নজল অব্দি ছোঁব না। বুঝেছিস্ তো আর আমার কথা তুই ফেলবি না।"

চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে সারিয়াদান দাদিবুঢ়ার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে

পড়ল। শুনে শুনে কুড়িবার মাথা ঠেকাল তারপর চলে এল। সেইদিন থেকে দুই সখীর বন্ধুত্ব ঘুচে গেল।

সন্ধ্যার সময় মুরানা নদীতে জল চিক্ চিক্ করে, ছলাৎ শব্দ ওঠে। কইসারি মাছরা তখন নদীর কূল বরাবর এসে জড়ো হয়। নদীর মাঝখানে বড় বড় পাথর ছড়ানো আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে ঘন বেনা ও কচুরীপানার ঝোপ। মাঝেমধ্যে মুঠিভরা সাদা মিহিবালি। ওই পাথরগুলির একটির ওপরে ঠেঙ্গাজানি পা লম্বা করে থ্যাবড়া মেরে বসে আছে। তার হাতে মাছ ধরবার বঁড়শী— তার থেকে সূতো ঝুলছে, তাতে কাঁটার বদলে একটি ছোট জ্যান্ত মাছ বাঁধা আছে ও মাছের মাথার কাছে গরুর ল্যাজের চুল দিয়ে তৈরি একটি ফাঁশ ঝোলান আছে। ওর কোমরের কৌপীনে একটি পাতার খিলিতে একটু রেড়ির তেল গোঁজা আছে। ঠেঙ্গাজানি আঁচল থেকে বার করে একটি *পিকা* ধরাল। তাতে একটান দিয়ে কানে গুঁজে রাখল। তারপরে জল থেকে বঁড়শীটা তুলে এনে ওই ফাঁশের গায়ে একটু রেড়ির তেল মাখিয়ে আবার জলে ফেলে ওৎ পেতে বসে রইল। কখন বড় কইসারি মাছ ছোট মাছটাকে খেতে এসে ফাঁদে ধরা পড়বে— তারই প্রতীক্ষায়।

ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঠেঙ্গাজানি মাছ ধরাতে মন দেয়। অন্য পাথরগুলির ওপর তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বক ও মাছরাঙা পাখিরা বসে আছে। কুরেই ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

মুরান নদীর দুই ধারের গাছে সুনারী ফুলের লম্বা বিনুনী বাতাসে দোলে। ঠেঙ্গাজানি বসে বসে মাছ ধরে।

ওর পিছনে গ্রামের ঘাট থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসে, আর শোনা যায় জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। পাশ ফিরে তাকালে নদীর বাঁকের এক চিল্‌তে দেখা যায়।

ঠেঙ্গাজানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ফাঁশে রেড়ির তেল লাগাতে ভুলে যায়। পিকা ধরাতেও ভুলে যায়। শুধু জলের দিকে একভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে থেকে কি যে ভাবে তার আদি অন্ত খুঁজে পায়না। শুধু অন্ধকারের ভারে ওর মুখের ছায়া জলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। *কুট্টার* ডাক শোনা যায়। ঝিঁঝির ঝিঁঝি ডাকে চারিদিক ভরে যায়। বর্তমান আর ভবিষ্যতের টানা পোড়েনে পড়ে মনটা দুলে দুলে যেখানে সেখানে আটকে থাকে। থেকে থেকে অতীত আর স্মৃতিতে খোঁচা মারে। কোনো সমাধানে সে পৌঁছাতে পারে না। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের নিচে শরবনের ভিতরে বাতাসের সন্ সন্ শব্দের মতো তার মনের জটিলতার মধ্যে করুণ রাগিণী বাজতে শুরু করে।

পিকা— দিশী চুরুট

কুট্টা— এক জাতের ছোট হরিণ

বাবা খোঁজ করে ছেলে কেন এখনো বাড়ি ফিরে আসেনি। মা ভাবে ছেলে গেল কোথায়? সেই কোন সকালে পাতার ঠোঙায় একটু ফেন খেয়েছিল— ওর পেট এখন নিশ্চয় পুরো খালি। অবশেষে ছেলে বাড়ি ফিরে আসে। বাবার বুক আনন্দে ফুলে ওঠে। সে ভাবে ছেলের মতো ছেলে বটে তার। বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয়, হাতের লাঠি— তাই ঠেঙ্গা দেখলে, শত্রুও ভয় পাবে।

দাদিবুড়া সব তোর দয়া।

মার পা যেন মাটিতে পড়ে না। ছেলের সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে দুটি লোকের দিনরাত্রি কেটে যায়। ছেলের বিয়ে হবে। বাড়িতে বউ আসবে। সে গুট গুট করে হেঁটে বেড়াবে। মিটি মিটি চাইবে। বুড়ো শ্বশুরকে চান করিয়ে দেবে। শাশুড়িমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসে জোয়ার রান্না করবে। মুর্‌দিশাক ধোবে।

জল আনতে গিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে পরজুনী বুড়ি দাদিবুড়ার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। পরণের কাপড় ঠিকভাবে গায়ে জড়াতে ভুলে যায়।

বুড়ো রাম নায়ক প্রতিদিন রায়েত প্রজাদের ফরমাস করে। কোনোদিন বলে আজ মুরগী বলি দাও, কোনোদিন বা *পারুয়া* পুজো করতে বলে, আবার কোনোদিন মদ তৈরি করতে বলে।

এইসব দেখে মনে হয় দাদিবুড়া যেন হাসছেন।

হরিজানি ও রাম মুদুলি দুজনেই কর আদায় করতে বেরোয়। নাপিত চাঞ্চেরী ডোম, তার বাবার আমলের পাকানো লাঠিখানি নিয়ে ওদের পিছু পিছু যায়। পথে যেতে যেতে হরিজানি তার মেয়ে সারিয়াদানের ও রাম নায়ক তার ছেলে ঠেঙ্গার গল্প করে। চাঞ্চেরী দুজনের কথাতে সায় দিয়ে মাথা নাড়ে। এইভাবে তারা জঙ্গলের মধ্যে আরো ছোটবড় অনেক গ্রামে যায়। রিবন্যু, নিংগামনের কাছে ছাগলটা, মুরগীটা ভেট নিয়ে যায়। পথ খুবই দুর্গম। কোথাও ছুঁচোল পাথর ছড়ান, কোথাও বা পা হড়কে যাবার মতো পিচ্ছল। আবার কোথাও খাড়াই পথ বেয়ে উঠতে বুক ফেটে যাবার উপক্রম। এই ভাবে তারা নানাবিষয়ে গল্প করতে করতে যাতায়াত করে। দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকিয়ে থাকে কিন্তু মন খুলে আসল কথাটা কেউ কাউকে বলতে পারে না। রাম নায়ক সারিয়াদানকে চাইতে পারে না, হরিজানিও পণের টাকার অঙ্কের কথা বলতে পারে না। এইভাবে দিন কেটে যায়।

গ্রামের লোকেরা দাদিবুড়ার দিকে তাকিয়ে দিন কাটায়।

গ্রামের মেয়েরা ঠেঙ্গাজানির গান শোনবার জন্যে কান পেতে থাকে। দাদিবুড়া নিশ্চল নিস্প্রভ হয়ে আকাশের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। শুধু হুঁকোবুড়ো কৌতুক করে। ওর শরীরে জীবনীশক্তির লীলাখেলা চলে। উইরা সব সার বেঁধে

পারুয়া— আদিবাসী দেবতা

এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া আসা করে। পুঁজিপতি সাহুকারের মতো ব্যাঙ জিভ লক্ লক্ করে ওদের খাবে বলে ওঁত পেতে থাকে। দাদিবুঢ়ার কিন্তু নড়চড় নেই। সে স্থির, কিন্তু ওর চারিধারে দুনিয়া স্থির থাকে না।

পোড়ুমরা করবার জন্যে কাছের জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় গ্রামবাসীরা উৎসব করে দাগ দিয়ে দিয়েছে। যতটুকু জায়গা পরিষ্কার করা হবে, তার সীমা চিহ্নিত করে এখানে সেখানে এক একটা বড় গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে একদিন মদ রান্না করা হবে। একসঙ্গে দেড়শো কুড়ুল চালিয়ে শাল, পিয়াল, আম, ডুমুর সব গাছ কাটা হবে। পাহাড়ের মাথা পরিষ্কার করে থক্‌থকে কাদার ঘোল ঢেলে বনের মানুষ সেখানে ফসল ফলাবে। জঙ্গল থেকে সে কি পায়? জঙ্গলের মালিক রাজরা, বাঘ বনের আর ডাঁশমশা হল ঝোপঝাড়ের কিন্তু একমুঠি ভাত মানুষের প্রয়োজন। *সুঁয়া*, অল্‌সি, জোয়ার ও রেড়ির ফল না হলে তার চলে না। এরপরে একদিন ফারিষ্টি আসবে। বন পোড়ানো হয়েছে দেখে তাদের কোর্টে যেতে বলবে। দাদিবুঢ়ার দিকে তাকিয়ে দিশারির নির্দেশ অনুযায়ী শুভক্ষণে ওরা কোর্টে যাবে। সেখানে জরিমানা বাবাদ টাকা দিলেও ঘাম ঝরিয়ে চাষ করা জমি থেকে কিছু লাভ তো নিশ্চয় হবে। ওইটুকুই যথেষ্ট। কারণ পাহাড়ের কাঁকড় থেকে জোয়ারের টাটকা ফেন বা পচানো ফেন থেকে করা "পেণ্ডম" লন্ধা মদের স্বাদ অনেক বেশি।

ইতিহাসের পাতা এগিয়ে চলেছে। দাদিবুঢ়ার পায়ে কাছে ঝরনার ধারে বে-আইনী মদ তৈরি শুরু হয়েছে। উনুনের উপরে পচা মহুয়া ফুলের ফেনা ভর হাঁড়ি। তার উপরে মুখোমুখি উপুড় করা আর একটি ছোট হাঁড়ি। জোড়ের মুখে গোবর লেপা হয়েছে। ওপরের হাঁড়ি থেকে একটি নলি লেগে আছে, নিচে রাখা নিবুদ ধরণী হাঁড়িতে। হাঁড়ির মধ্যে হাঁড়ি রেখে তৈরি হয়েছে এই ধর্‌নি হাঁড়ি। দাদিবুঢ়াকে ভোগ দিয়ে মদ রান্না শুরু হয়েছে। মহুয়ার মদ খেয়ে সকলের চোখ নেশায় ঢুলুঢুলু। ঘরে ভাত নেই কিন্তু পেটে বে-আইনী রান্না করা মদ। তাই সকলের মুখে অনর্গল হাসি লেগেই আছে। পাহাড়ের উপরে রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওরা দিনরাত চাষের কাজ করে চলেছে।

দাদিবুঢ়া যেন তাকিয়ে দেখছে আর হাসছে।

অল্‌সি ফুল ফোটা দেওয়ালী মাসের এক দুপুরে ওপরের চিলবেড়া জঙ্গল থেকে নিচে খাদের দিকে ঠেঙ্গাজানি নেমে আসছিল। সামনে পাচেড়ি পর্বত— টপ্‌কালে লুল্লা উপত্যকার ঢাল শুরু হয়। শীতের দুপুরের রোদ কেমন যেন মিঠে মিঠে— আর তার মনটা ছিল মাতোয়ারা— যেন দুলছে। ঢালটি খুব কিছু বড় নয়। চারিদিকে

পোড়ুমরা— ঝুম চাষ
সুঁয়া — এক প্রকার ঘাসের বিচী— গরীব লোকেরা খায়।

কামরাঙ্গার শিরের মতো পাহাড়ের ধার নেমে এসেছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বন পরিষ্কার করে করা অল্‌সি ক্ষেত— হলুদ রঙের ফুলে ভরা। ঢালের নিচের দিকে আধাপোঁতা মেঠো ঝরনা তাতে ফিকে সবুজ রঙের ধান ক্ষেত। বুক অব্দি উঁচু ধান গাছ হয়েছে। এর মাঝখান দিয়ে গেছে এঁকে বেঁকে লাল রঙের আলের রাস্তা ঠিক যেন খণ্ডিতার সিঁদুর পর সিঁথি।

চোখ ঝলসানো দুপুরের নেশা ঠেঙ্গাজানির মনে ঘোর লাগিয়েছে। সে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল। ঝরনার ধারে রাখা মসৃণ পাথরটার কাছে ও স্থির হয়ে দাঁড়াল। শিকারী বন্দুকের ঘোড়া টিপবার আগে যেমন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানে সেও সেইভাবে চারিদিক তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কেউ কোথাও নেই— দহিখুআ পাহাড়ের চারিদিকে কার্তিকের ঝক্‌ঝকে রোদ উজাড় হয়ে পড়ে হাসছে আর যেন সকলকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঠেঙ্গাজানি মুখ তুলে তাকাল।

এলিয়ো প্রাচীনের ছোটবাই অলেইবিরিয়ার মেয়ে সন্তোষকুমারী ধীরে ধীরে নদীর ধার থেকে উঠে আসছিল। খোলা চুল থেকে জল ঝরছে। গায়ে কাপড় ঠিক করে পার নেই। ঠেঙ্গাজানিকে দেখতে পেয়ে সে ভাল করে তার দিকে তাকাল। সন্তোষকুমী একটু দূরে সরে গিয়ে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল। দু হাতে নিংড়ে নিংড়ে চুল থেকে জল ঝরাল। তারপরে সবুজ শাড়িখানি পড়ল। ব্লাউজ পরে ছোট ছোট বোতামগুলি লাগাল। ঠেঙ্গাজানি চুপ্‌চাপ্ দুড়্‌মুড়্ বুকে তার দিকে চেয়ে রইল। সন্তোষকুমারী অলসভরে চুল ঠিক করল। হঠাৎ সে ঠেঙ্গাজানিকে দেখতে পাওয়ার ভান করে, একগাল হেসে তাড়াতাড়ি আঁচলখানি কাঁধের উপর তুলে নিল। তারপর পিছন ফিরে একটি একটি পা ফেলে সে এগিয়ে গেল।

ঠেঙ্গাজানি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। প্রথমে সে খুব অপ্রস্তুতে পড়ল। মুহূর্তে ওর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল— এগোবে না ফিরে যাবে। শেষে কৌতূহলের জয় হল। সে এগিয়ে চলল।

ঢালের ওধারে পাহাড়ে উঠতে গেলে একটি *ঝোলা* পড়ে। জলের ধারা সোজা পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে। তার এক পাড় ঘন লতায় ঢাকা। অন্য পাড়টি ঘন ঝোপে ঢাকা ও খুব তীক্ষ্ণ। নিচের ছলছল জলের ধারাটি উপত্যকার নদীতে গিয়ে মিশেছে। জলের এই কুলকুল আওয়াজ নিস্তব্ধতার মধ্যে বড় মধুর শোনায়। শুঁড়ি পথটি ছায়ায় ভরা— ঠাণ্ডা, লতা ও ঝোপের মধ্যে দিয়ে ঠিক একটি সুড়ঙ্গ পথের মতো।

সেই ছায়া ঢাকা পথ বেয়ে উঠতে থাকল দুটি প্রাণী। একটু আগে আলেইবিরিয়ার মেয়ে সন্তোষকুমারী ও তার কিছু পিছে ঠেঙ্গাজানি। এতবড় নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে কেবল ওই দুটি মানুষ।

ঝোলা— পাহাড়ী ঝরনা

সন্তোষকুমারী অলসভরে পথ চলে। ফুল ভরা কাঁটা-লতা ওর আঁচল টেনে ধরে গাছের শিকড় ওর পায়ের গোছে জড়িয়ে যায়। ফিরে নিজেকে মুক্ত করবার আছিলায় সে বুকের কাপড় আল্‌গা করে দেয়। ধুক্ পুক্ বুকের ওপরে আধখোলা ব্লাউজের বোতাম আবার টিপে টিপে লাগায়। পিছন থেকে ঠেঙ্গা জ্বলন্ত শিকারীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকে। সন্তোষকুমারী ফিক্ করে হাসে, ঠেঙ্গার বুকের ধুক্‌পুকানি আরো বেড়ে যায়।

এইভাবে কিছু সময় গেল। তার দুজনে সম্বরখোঁজ বলে একটি পাথরে চাতালের কাছে পৌঁছল। ওখানে চারধার গাছ আর লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে পাহাড়ের খাড়াই দেয়াল যেন কেটে তৈরি করা। সামনে সরু একটি রাস্তা খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। নিচের দিকে ঢালু। চাতালের মধ্যে হরিণের খুরের চিহ্নর মতো দুটি দাগ দেখা যায়। একদিকে একটি বড় পাথরের ধার থেকে ঝির্ ঝির্ করে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে।

সন্তোষকুমারী সেই চাতালের উপর পা লম্বা করে বসে দুই হাতে নিজের পা টিপ্‌তে লাগল। ঠেঙ্গাজানি ক্রমশ নিচে থেকে উঠে এল। সন্তোষকুমারী ওর দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বলল— "কিরে, ওরকম করে আমার দিকে কেন তাকিয়ে আছিস্? তোর মুখে তো একটিও কথা নেই।" দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে, ঠেঙ্গাজানি আরো এগিয়ে এল। সন্তোষকুমারী কথা কটি বলে পাথরের চাতালে লুটিয়ে পড়ে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

মুখে একটুও কথা না বলে ঠেঙ্গা ওকে দুহাতে তুলে নিল ফুলের মতো, বুকে চেপে ধরে জলঝরা পাথরের পিছনে নিয়ে গেল।

উপরে ঘোলাটে আকাশ, নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। চোখে পড়ে নদীর ধারের হালকা সবুজ ধানক্ষেত আর পাহাড়ের কামরাঙ্গার শিরের মতো গা-হলুদ আল্‌সি ফুলে ঢাকা।

৪

এত বড় পৃথিবীতে সবকিছু পড়ে রয়েছে। কতলোক হৃদয়ে লক্ষ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ক্ষুধার্ত মনে ধূ ধূ বালির দিকে চেয়ে চেয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। তাদের আশ মেটে না। তাকিয়ে থাকা সার হয়। যে হাত বাড়ায় সে যাইহোক কিছু পায়। অন্তত সে তার দেহের ক্ষুধা মেটায় যদিও তার তৃষ্ণা, তার বাসনা বাড়ে আরও।

শুধু তাকিয়ে থাকলে, তাকিয়ে থাকাই সার হয়। দাদিবুঢ়া টিপির উপর থেকে শুধু চেয়ে থাকে, আর নিচের পৃথিবীর কিছু আশাবাদী লোক আশা নিয়ে চেয়ে থাকে।

সন্তোষকুমারী কিন্তু চেয়ে থাকবার পাত্রী নয়। সে নিজেকে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাতে পারে যে মাঝে মাঝে তাকে ডোমের মেয়ে বলে মনে হয় না। মনে হয় সে শুধু সন্তোষকুমারী। ধর্ম শিখবার জন্যে সে অনেকবার কোরাপুট শহরে গেছে। সেখানে বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া নীতিজ্ঞান তার মনে দাগ কাটেনি। ওর শুধু মনে আছে গীর্জা ঘরের উঁচু চূড়ো, যেখানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে আর উৎসব হয়। দূরের নিকটের বহু মানুষের মেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে ওর মনে হয়েছে এক বহু ও বহু এক। আর মনে আছে নানান জায়গা থেকে আসা ডোম মেয়েদের— যারা সব সময় হাসিখুশি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সুন্দর সুন্দর রঙ্গীন শাড়ি ও ব্লাউজ পরে। ও তাদের দেখে পরিষ্কার থাকতে শিখেছে। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পরা ও সময়ে অসময়ে অন্য আবরণের ব্যবহার শিখেছে। অনেক কিছু শিখেছে শুধু প্রতীক্ষা করতে শেখেনি। অন্ধকার রাতে শহরের মোড়ের রাস্তায় মাল-বওয়া লরীগুলোকে আটকে থাকতে দেখেছে। লম্বা লম্বা লাঠিহাতে বাবুর দলকে এগিয়ে আসতেও দেখেছে। বৃষ্টিরাতের অন্ধকারে পান্থশালার আরাম উপভোগ করেছে। এইসব দেখতে দেখতে সে একটা কথাই বুঝেছে— কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না— জল গড়িয়ে চলে— যে আটকে থাকে সে পাথর বৈ অন্য কিছু নয়।

কোরাপুট— পাহাড়ের উপর আলোয় সাজানো সুন্দর শহর তার স্বপ্নের ভিতরে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু শুধু স্বপ্ন— বছরে মাত্র দুতিনবার। সব সময়ে ওর ওখানে যাওয়া হয় না, কিন্তু মনের চাহিদা— অবস্থা বোঝে না। জঙ্গল তার কাছে মরুভূমির মতো মনে হয়। কি আছে এই জঙ্গলে? শুধু পাথর আর গাছ। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো ক্ষেত। এখানে কেউ বেড়াতে বেরোয় না। বেরুনো মানেই ক্ষেতে মাটি কোপাতে যাওয়া বা জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়া। সারাদিন ধরে শুধু রান্না কর, কন্দ খুঁড়তে যাও, শাক ধোও। রাতে যখন নাচ হয়, তখন পরজা ধাংড়াদের সঙ্গী হয় পরজা ধাংড়ীরা। পরজা সম্প্রদায়ের সকলে জাতি হিসাবে ডোমদের ঘৃণা করে। আর ডোম আছে মাত্র চারঘর। তাদের ধাংড়া মাত্র তিনজন। একজনের নাম বেণিয়ামনি— সে মুখ ধোয় না, দাড়িগোঁফও কামায় না। দ্বিতীয় জনের নাম মসিক্— ওর দিকে তাকানো যায় না। সে বড়ই অসুন্দর কিন্তু একমাত্র সে-ই তাড়াতাড়ি মরা গরুর গা থেকে ছাল ছাড়াতে পারে। গরু কেটে মাংস করতে পারে। ব্যবসা দেখাশোনা করে। সে অসুন্দর বলে সন্তোষকুমারী তাকে চায় না। আর তৃতীয় জনের নাম সিমন্— সে অসুস্থ। তার পেট ফোলা ফোলা।

রাতে নাচের সময়ে সাতজন ডোমধাংড়ী একহাতে এক টুকরো ন্যাকড়া ও অন্যহাতে অপরের কোমর জড়িয়ে "ওহো, হো" করে চিৎকার করে লাফিয়ে

কন্দ — রাঙ্গাআলু

লাফিয়ে, নাচতে নাচতে পরজা ধাংড়ীদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে পরজা ধাংড়াদের ঘিরে নাচে। নাচতে নাচতে মদ খাওয়া হয়। মদ খেয়ে নাচতে নাচতে আকাশ ক্রমে অন্ধকারে ভরে যায়। তখন কিছুক্ষণের জন্যে জঙ্গলকে ভুলে থাকা যায়। আর ভুলে থাকা যায় যখন ওরা নন্দিগ্রাম হাটে যায়। সেখানে নানান জায়গা থেকে আসা ডোমদের সঙ্গে দেখা হয়। করমর্দন করে পরস্পরের খবরাখবর আদানপ্রদান হয়, তখন এতোটা খারাপ লাগে না।

থেকে থেকেই বড় শহরের স্মৃতি খোঁচা মারে। বড় শহরের দুদিনের সুখানুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঘোলাটে স্বপ্নের ভিতরে দেখা যায়— শহরের বড় বড় চওড়া রাস্তা— তাতে মোটরগাড়ির পর মোটরগাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়ি ভর্তি হাসির ঝরনা ঝরিয়ে ধাংড়া-ধাংড়ীর দল চলেছে আসামে। "আসাম" কথাটার নামেই মহুয়া মদের নেশা ধরায়। সেখানে সুদ, খাজনা, ঊষর জমি বা কন্দ এসব কিছুই নেই। সেখানে শুধু আছে বড় বড় লাঠি হাতে অধিকারীর দল। নানা রকমের শাড়ি ও নানা রঙের ব্লাউজ— তাদের বুকে টিয়াপাখি, তারা বা বাঘের মুখ আঁকা। মাথার তেলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে। এছাড়া আছে পিপে ভর্তি ভর্তি মদ।

তাই সন্তোষকুমারীর খুব উদাস লাগে। ভাবে এই জঙ্গলে এমন একজন নেই যাকে দেখিয়ে সগর্বে বলা যেতে পারে "এই আমার মরদ"। মসিক্— ছিঃ— থুঃ— কী কুৎসিত ওর মুখখানা— যেন আস্ত নয় আধখানা— আর তাতে যেন সর্বক্ষণ গরুর চর্বি মাখিয়ে রেখেছে। আর ওর গায়ের চামড়া মানুষের নয় যেন মোষের।

সন্তোষকুমারী ঝরনার জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয় আবার পরমুহূর্তে ওর মন বিদ্রোহ করে ওঠে। শহরের দুদিনের সুখানুভূতি তাকে জ্বালিয়ে মারে। একদিকে সিম্‌ন, মসিক্, বেণিয়ামণি ও জঙ্গল পাহাড় পর্বত অন্যদিকে সুন্দর শহরের হাতছানি। সে তাই অতৃপ্ত ও বহুতোমুখী।

এই হল তার বিশেষত্ব। সারিয়াদান, সারিয়াফুল, সকলের থেকে সে পৃথক। তাই ঠেঙ্গাজানি প্রতি মুহূর্তে দেখে সে নতুন, ঠিক যেন দিনের বিভিন্ন সময়ে জঙ্গলের ওপরের আকাশের আলোর রঙের মতো।

সবসময়ে সে ঝকঝকে তাজা।

সেই প্রথমদিকের দেখার পর থেকে সন্তোষকুমারী নিজেকে গুটিয়ে নিল। আর সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। কাজেই ঠেঙ্গাজানি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার পা দুম্‌দুম্ পড়ে, কান খাড়া হয়ে থাকে আর চোখ তীক্ষ্ণভাবে খুঁজে বেড়ায়। কখন কোন পথ ধরে সে আসবে।

সন্তোষকুমারী এসেও আসে না। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে শুধু ফিক্ করে হাসে। কখনো বা শুঁড়ি পথ বেয়ে ওঠানামার সময় ওদের দেখা হয়— ব্যাস ওইটুকুই— তার বেশি কিছু নয়। কাজেই ঠেঙ্গাজানি রাতদিন তাকে স্বপ্নে দেখে। ধাংড়াঘর বিষের মতো মনে হয়। সর্বদা তার প্রতীক্ষায় থাকে।

মুখ খুলে কাউকে কিছু বলা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ওদের জাত আলাদা ডোম আর পরজা। বাবা শুনলে বাড়িতে আগুন লাগাবে আর মা মাথা খুঁড়ে মরবে। পাড়ার লোকে পঞ্চায়েত ডাকবে, নিষ্পত্তি করে ভোজের জন্যে মুরগী, মদ সব আদায় করবে।

প্রথম অভিযানের পর ঠেঙ্গার খালি অস্থির অস্থির লাগে। ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে কান পেতে কারা যেন সব শুনেছে। তার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকে সব জানে সময় বুঝে রহস্য ফাঁক করার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করছে। তাই সব কিছুতেই তার সন্দেহ। মনের গভীরে ভাবের ঢেউ উথালি পাথালি করে সে তাকে যত চেপে রাখতে চেষ্টা করে ততই ফুলে ওঠে। ওর মনের আকাশে সন্তোষকুমারীর স্মৃতি বিস্তার লাভ করতে করতে পুরো দিগ্‌বলয় ছেয়ে ফেলে।

এতদিনে দশজনের মধ্যে থেকে একজনের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়েছে— একজনকে সে বেছে নিয়েছে— কিন্তু বেছে নেওয়াটাই সার হয়েছে। সন্তোষকুমারীর স্মৃতি যেন বয়ে যাওয়া ঝরনার দুই কূলে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা বিনুনী ঝোলান লাল সুনারী ফুলের গাছ বা সাদা ধপ্‌ধপে থোকা ফুলের গাছের সারি।

সারিয়াদান কোঁচড় ভর্তি কুল নিয়ে নির্মল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। ঠেঙ্গাজানিও ঘাবড়ায় না। সেও সোজাসুজি তাকায়। হাসতে হাসতে কুলগাছের কাঁটা ডাল ঝুঁকিয়ে কুল পেড়ে সারিয়াদানের কোঁচড় ভরে দেয়। সে ঠাট্টা করলে তার জবাব সে ঠাট্টা করেই দেয়। ওর চক্‌চকে খোঁপার দিকে তাকিয়ে মনটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরে যায়। ধাংড়াঘরে গানে উত্তর দেবার সময় গলা কেঁপে উঠলেও সে থেমে যায় না। ওর স্বর খ্যান্‌খ্যানে শোনালেও গলা পুরো ধরে যায় না। কিন্তু হাসির মাঝে সে থম্‌কে গিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে থাকে কার প্রতীক্ষায়। বাইরের আলো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শেষে ক্লান্ত হয়ে ভোররাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন উঠতে উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সবার শেষে তার ঘুম ভাঙে।

কখনো কখনো সে দাদিবুড়ার কাছে যায়। প্রণাম করে, গুম্ মেরে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ তখন মনটা যেন একটু হাল্কা হয়। চারিদিক তখন নিস্তব্ধ।

৫

সেদিন রাম নায়ক ও তার স্ত্রী দুজনের খুব কথা কাটাকাটি হল। ঠেঙ্গার মা বলল— ‘‘আমার একটি মাত্র ছেলে, সে জোয়ান হয়েছে কিন্তু তুমি কিছুতেই তার বিয়ের কথা ভাবছ না। তোমার কিসের অভাব? অন্যদের মতো ঠেঙ্গাকে পণের টাকা জোগাড় করতে ঘুরতে হবে নাকি?’’

তখন নায়ক জানাল—‘‘আমি পণেরে টাকা দেব না, একথা বলিনি। ছেলে যখন চাইবে তখন তার বিয়ে হবে। আমি কি করতে পারি?’’ ঠেঙ্গার মা উত্তরে বলল— ‘‘এই জগতের সব ছেলেরা কি তোমার মতো হয়েছে? তুমি আমার মুখে কাপড় গুঁজে, তুলে এনে উদুলিয়া বিয়ে করেছিলে— সকলেই কি এতোই বেহায়া যে উদুলিয়া বিয়ে করবে না হলে নয়?’’

রাম নায়ক বলল— ‘‘তোমার মনে যদি এই ধারণা হয়ে থাকে তবে যেখানে সে চাইবে আজই তার বিয়ে দাও।’’ ঠেঙ্গার মা বলল— ‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ সব বুঝি— হাত থেকে পণের টাকা বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া ছেলের বিয়ে হলে— রাত্রে মাচানের উপর জেগে কে তোমার ক্ষেতে *পাচি* পাহারা দেবে? এইসব ভেবে তুমি এত বাহানা করছ। এদিকে বলে আমার একটিমাত্র ছেলে।’’

রাম নায়ক খুব রেগে গেল। যেদিও সে জানে তার স্ত্রী বড়ই অবুঝ তবুও তার ভাল কথায় টিপ্পনী দিলে তা গা জ্বালা করে। বিশেষ করে তার নিজের উদুলিয়া বিয়ের কথা উল্লেখ করলে। যদিও একথা সত্যি সে উদুলিয়া বিয়ে করেছিল।

অতি প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী আগের থেকে কনেকে রাজি করিয়ে বর দুতিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত পয়। কনের মুখে কাপড় গুঁজে, তাকে চুরি করে নিয়ে আসা হয়। মাত্র পাঁচদশজন অতিথিকে ডেকে ছোট ভোজ দিয়ে বিয়ে সেরে ফেলতে হয়। না বাজে ঢাক, ঢোলক না তৈরি হয় মণ্ডপ। তারপর কন্যার পিতা মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হন। পাঁচসাত জনকে ডেকে পঞ্চায়েত সভা বসানো হয়। সামান্য পণের টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হয়। সে একা নয়, বেশিরভাগ গরীব লোক এই পদ্ধতি অনুযায়ী কম খরচে বিয়ে করে থাকে। যদিও ওর বিয়ের পরে অনেকদিন কেটে গেছে ওর স্ত্রীর মন থেকে উদুলিয়া বিয়ের দুঃখ ঘোচেনি। আর থেকে থেকে সে তার প্রয়োজন বুঝে এই কথা তুলে খোঁচা মারে যাতে সে মরমে ব্যথা পায় ও বিরক্ত হয়।

পাচি— শস্য বিশেষ

সকাল থেকে রাম নায়ক কিছু না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। পরজাদের ভাত খাবার সময় দুপুর বারোটা— অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। সে কিন্তু মাঠ থেকে বাড়ি ফিরল না। পাহাড়ী ঝরনার ধারে জমি কুপিয়ে চৌরসড় করে এক টুকরো নতুন জমি বার করবার চেষ্টা করছে। জমি কোপাতে কোপাতে সে রাগ ভুলে গেছে। ওর মাথায় তখন একটাই চিন্তা কিভাবে আধ বোজা ঝরনার উপরে আড়াআড়ি দু জায়গায় বাঁধ দিলে, সামনের বছর সেখানে পলিমাটি জমে যাবে এবং ওই ক্ষেতে বুক অব্দি উঁচু ধান গাছ হবে। আর ভাবছে ক'হাঁড়ি মদ রান্না করলে জন-মজুর সকলকে একটু একটু দিয়ে ক্ষেতে কাজ করাতে পারবে। এরা আবার পয়সার থেকে মদকে বেশি চেনে। এছাড়া কত চওড়া বাঁধ বেঁধে দেবে এবং কত বড় ক্ষেত তৈরি করা যাবে এই চিন্তায় সে বিভোর। পাহাড়ী ঝরনার ধানে হাঁটু অব্দি উঁচু নানা জাতের *কুরাড়ি শাক* হয়ে আছে। মাঝে মধ্যে কোদালীর ডগায় খানিকটা খানিকটা রাঙ্গা আলু উঠে আসছে। এই রাঙ্গা আলু খুব মিষ্টি খেতে। বুড়ি এর সঙ্গে জোয়ারের আটা মিশিয়ে খুব ভাল ঝোল রান্না করে— তাই সে ভেবেছে বাড়ি ফিরবার সময় সেগুলি নিয়ে যাবে।

প্রচণ্ড রোদে কাজ করতে করতে ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। খিদে যত বাড়ছে বুড়ির উপর রাগও ততোধিক বাড়ছে। বুড়ি কিছুতেই বোঝে না। শুধু বলে— বাবা যেন চেয়ে বসে আছে কতদিনে তার একটি মাত্র ছেলে উদুলিয়া বিয়ে করুক। সত্যি বুঝি এইরকম বিয়ে করতেই বাবা ছেলেকে শিখিয়েছে।

গাছের ছায়ায় রামা নায়ক একটুক্ষণ জিরোতে বসল। নিস্তব্ধ দুপুরে পাতার খড় খড় আর জলের কুল্‌কুল্‌ শব্দ ওর কানে আসছিল। সে এক টুকরো শুকনো কাঠের উপর আর একটি শুকনো ডাল দুহাতের তেলো দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে, ঘষে প্রথমে আগুন ধরাল। সেই আগুনে *পিকা* ধরিয়ে রাগের চোটে তাতে জোরে জোরে টান দিতে লাগল। মনে মনে ঠিক করল অন্তত বুড়ির এই অহঙ্কার ভাঙতে অতি শীঘ্র ঠেঙ্গার বিয়ে দেবে। তিন চার কুড়ি টাকা পণ হিসাবে দেবে, তিন কুড়ি টাকা খরচ করে ভোজ দেবে।

অনেক ভেবে রাম নায়ক এলিয়ো প্রাচীনের বাড়ির দিকে চলল। প্রাচীন যদিও জাতে ডোম, সে কিন্তু খুব বুদ্ধি ধরে। সে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছে। অনেক সাহেব দেখেছে। কোর্টেও গেছে। প্রাচীন রামের থেকে বয়সে অনেক বড়। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে সব কথা স্থির হয়ে শোনে, ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়। কেউ না থাকাকালীন বড় ব্যাপারে নায়ক ওর সঙ্গে পরামর্শ করে, কিন্তু সকলের সামনে রাম

কুরাড়ি শাক— ফার্ণ গাছ

পিকা — দেশী চুরুট

ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। প্রাচীনের কথা হেসে উড়িয়ে দেবার ভান করে কিন্তু পরে নিজের দুটি কথা জুড়ে ওর কথাই সে সকলকে বলে— কারণ সে যে গ্রামের নায়ক।

সে ভাবতে ভাবতে গেল, ঠেঙ্গার মা কেমন অবাক হবে। "হাঁ" করে তাকিয়ে থাকবে। আর একদিনও মুখ খুলতে পারবে না। সে এতদিন যা-কিছু খরচা করেছে সব ঠেঙ্গার মা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। নিজের উদুলিয়া বিয়ের কথা তুলে প্রতিবার খুঁচিয়েছে। সত্যি বুঝি রাম নায়ক পয়সা খরচা করে সুখ পায় না। সে ভারি কৃপণ— এবার ঠেঙ্গার মা দেখবে কলিযুগের রামচন্দ্র নায়ক ছেলের বিয়েতে দশটা বড় বিয়ের টাকা খরচ করতে পারে।

বারান্দায় বসে প্রাচীন একটি কাগজে খ্রীষ্টানদের করের ফর্দ তৈরী করছিল। প্রতিটি খ্রীষ্টানের প্রতিটি লাঙল বাবাদ সে চার আনা আদায় করে। সব জড়ো করে পাষ্টরকে দেয় পাষ্টর আবার সেটা পাদ্রী সাহেবকে দেন। পাদ্রী সাহেব নানা কাজে ওই টাকা খরচ করেন। গীর্জাঘর চুনকাম হয়। পূজাপার্বণে উৎসব হয়, ও অনেকগুলি স্কুলের খরচ চালানো হয়। যদিও এই সমান্য টাকায় সব খরচ কুলায় না তবু কিছুটা সুবিধা হয় বৈকি। ধর্মের নামে খ্রীষ্টানরা এই টাকা দিতে বাধ্য।

প্রাচীন তার হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত ছিল। কাছে দাঁড়িয়ে আলেইবিরিয়ার মেয়ে সন্তোষকুমারী একটি হাঁড়ি থেকে পচা জোয়ার শুয়োরের বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছিল। সূর্য তখন দুই লাঠি ওপরে উঠে গেছে। নায়ক তার কাছে পৌঁছে বলল— "প্রাচীন, আমি ঠেঙ্গার বিয়ে দেব।" প্রাচীন বলল— "এ তো খুব ভাল কথা। কনে ঠিক করেছিস্ তো?" তখন নায়ক যেন আকাশ থেকে পড়ল। সত্যি তো! সারা পথ সে শুধু বিয়ের জাঁকজমকের কথা চিন্তা করে এসেছে। কনে কোথা থেকে আনবে সে বিষয়ে তো কিছু ঠিক করেনি। সারিয়াদানের কথা ওর মনে এল, কিন্তু গ্রামের মেয়ে বলে যেন একটু অপছন্দ হল। সে বলল— "প্রাচীন, তুই কনে ঠিক করে দে।"

এর উত্তরে প্রাচীন জানাল— "আমি কেন কনে ঠিক করব? ঠেঙ্গা নিজে কেন ঠিক করছে না?"

নায়ক বলল— "সে ঠিক করেনি সেটা তার ইচ্ছা— আমি আর কতদিন তার অপেক্ষায় বসে থাকব?"

তখন প্রাচীন বলল— "তোর কনে কে ঠিক করেছিল রে?"

এই বলে দুজনেই হেসে ফেলল। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে সন্তোষকুমারীও মুখটিপে হাসল।

নায়ক বলল— "প্রাচীন, তুই জানিস্ না। আজ তার মা আমাকে যা খুশি তা বলেছে।"

নায়ক আবার সকালের ঘটনা বলতে লাগল। প্রাচীন আরো হাসল।

শেষে প্রাচীন বলল— "সারিয়াদান?"

নায়ক গুম্ মেরে বলল— "সে তো আছেই, তোর খোঁজে যদি আর কেউ থেকে থাকে।"

প্রাচীন বলল— "নিজের গ্রামের চেনাজানা মেয়ে ছেড়ে তুই কেন অন্য গ্রামে অন্য মেয়ের খোঁজে যাবি?" আবার একটু চিন্তা করে বলল— "ঠিক আছে, ভেবে দেখব।"

ওখানে বসে সন্তোষকুমারী চোখ পিট্ পিট্ করে সব শুনল। চুপচাপ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। বাচ্চাগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে বড় শুয়োররা হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে সব খাবার খেয়ে নিল। সন্তোষকুমারী সেদিকে খেয়াল করল না।

এরপরে নায়ক দিশারির কাছে গেল। ঠেঙ্গার মা আজ তাকে খোঁচা মেরেছে। সব কিছু নিষ্পত্তি করে সে বাড়ি ফিরবে। সে দিশারিকে বলল— "দিশারি, ঠেঙ্গার বিয়ে দেব।"

"দে, দে, নায়ক; দে, দে।"

"শুভক্ষণ তুই দিবি, তবে তো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব, না বলব না" বলে দিশারি মাথা নাড়ল। "এই তো সবে মাঘ মাস পড়েছে, মাঘ যাবে, ফাল্গুন যাবে, চৈত্র না এলে পরজাদের বিয়ে হয় না। চৈত্রমাস আসুক, তখন একদিন আসিস্, পাঁজি দেখে গুরুমাঈকে ডেকে বিয়ের দিন ঠিক করে দেব। আর তাহলে তুই এখন থেকে বিয়ের জোগাড় যন্ত্র করে রাখ। ঘর তৈরি কর, দান, জোয়ার সংগ্রহ করে রাখ।"

তখন নায়ক বলল— "সে সব ঠিক আছে। তুই প্রথমে একটা কনে ঠিক করে দে, দিশারী।"

"কনে!" দিশারি বুড়ো আশ্চর্য হয়ে তাকাল। "কনে ঠিক করবার আমি কে রে?" ছেলে তো নিজে কনে ঠিক করবে। আমি শুধু শুভক্ষণ ঠিক করে দেব, তুই বিয়ে দিবি। আমি ভোজ খাব, মদ খাব। সব ধাংড়া-ধাংড়ীদের মঙ্গলের জন্যে দাদিবুঢ়া, *ঝাকর দেবতার* কাছে প্রার্থনা জানাব। আমি বুড়ো মানুষ। তোর জোয়ান ছেলের জন্যে আমি কেন কনে ঠিক করব।"

দিশারি বুড়ো খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। ওর শুধু দেবতাদের ব্যাপারে কিছু করবার অধিকার আছে। ছোকরাছুকরীদের বিয়ের ব্যাপারে ওর কোনো হাত নেই। নায়কের এই আশ্চর্য প্রস্তাব শুনে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশি কথা বলে না। তার মূক দেবতা তাকেও মূক করে দিয়েছে। কিন্তু এ প্রস্তাব বড়ই অসঙ্গত, অসম্ভব। পাহাড়ী জাতির ইতিহাসে ধাংড়া ছাড়া অন্য কেউ কনে ঠিক

ঝাকর দেবতা— আদিবাসীদের ঠাকুর

করে না। এমন ঘটনা কেউ কোনদিন শোনেনি পর্যন্ত। দিশারি ভাবল নায়ক বুঝি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

দিশারির ঠাট্টা ভাল লাগে না। সে শুধু কাজের কথা বোঝে। ঠাট্টা তামাশার দিন তার বহুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা তার মনে পড়ল। টাকার অভাবের জন্যে সে নিজের বিয়ের পণের দু'কুড়ি টাকা জোগাড় করতে না পেরে শেষে শ্বশুরের জমিতে চার বৎসর জন খেটেছিল। কনের নাম ছিল মঙ্গলি। বছরের মধ্যে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন তার মঙ্গলির সঙ্গে দেখা হলেও কৌলিক প্রথাকে মনে রেখে টাকা শোধের চার বৎসর পূর্ণ না হওয়া অব্দি তার পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। সেই সময় নিয়মকানুন খুব কঠিন ছিল। মানুষের মন শক্ত ছিল। কোমরে জোর ছিল।

পুরো ধার শোধ হবার পর মঙ্গলি ওর কাছে এসেছিল মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে। তিন বছরের ছেলে ঝালিয়াকে রেখে সে জ্বরে ভুগে মারা গেল। ঝালিয়াকে বুকে চেপে দশ বছর কাটাবার পর এক শীতে বাঘ তাকে টেনে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে কেউ কখনো দিশারি বুড়োকে হাসতে দেখেনি।

দিশারি ঘন চোখের পাতার আড়াল থেকে আড়চোখে নায়ককে দেখে বলল— "আমি কেন কনে ঠিক করে দেব রে, নায়ক!"

"নারে তোর ইচ্ছা, তোর খুশি, আমি ত পারছি না। দেখে শুনে যেখানে হোক কনে ঠিক করে দে।"

"পোলাকে জিজ্ঞেস কর, সে যাকে চাইবে, তাকে ঠিক কর।"

"ছেলে বলবে— আমি কি জানি?"

দিশারি গম্ভীর হয়ে বলল— "জিজ্ঞাসা করেই দেখ।"

নায়ক ভাবল বেরিয়েছে যখন, তখন যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরবে। কি মনে করে সে সোজা দাদিবুঢ়ার কাছে গেল। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে দাদিবুঢ়াকে প্রণাম করে বলল— "দাদিবুঢ়া; আমার পোলার জন্যে তুই একটা কনে ঠিক করে দে।"

নিচে বস্তি, ওপরে পাহাড়ের চূড়ো, চড়চড়ে রোদে সব কিছু কেমন নির্জীব দেখাচ্ছে। চারিধারের নীল পাহাড়ের বেড়াটাকে খুব শুকনো মনো হচ্ছে। ঠুঁটো সাতখাঁজ কাটা খেজুর গাছের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে রামচন্দ্র নায়ক মনে শান্তি পেল।

দাদিবুঢ়াকে সে বলতে পেরেছে।

সে বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু কাকে সে ছেলের বউ করবে, কিছুই ঠিক হল না।

ঠেঙ্গাকে অনেকবার সে ও তার স্ত্রী এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই ঠেঙ্গা এড়িয়ে গেছে। কোনোবার সে বলেছে সে জানে না। কখনো বা বলেছে সে

বলতে পারছে না কিংবা সে ভাল করে ভেবে দেখেনি। সারিয়াদানের কথা বারবার রাম নায়কের মনে এসেছে, আবার ভেবেছে, আর দু'চার জায়গায় দেখা ভাল। হরিজানি বেশি টাকা চাইতে পারে বা সারিয়াদান গ্রামের মেয়ে, ওর থেকে ভাল মেয়ে পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সেইদিন থেকে সে ঠেঙ্গার বৌ এলে, থাকবে বলে, নিজের ঘরের লাগোয়া আর একটি ঘর তৈরি শুরু করে দিয়েছে। ধীরে, ধীরে ঘরের অনেকটা তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু বৌ আর ঠিক করা হল না।

গ্রামে এই নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেল— নায়ক ছেলের জন্যে কনে খুঁজছে। কারণে অকারণে দাদিবুঢ়ার কাছে অনেক বলি দেওয়া হল। প্রচুর ফুল জমা পড়ল ও মদ ঢালা হল। জানি দাদিবুঢ়াকে এক টুকরো নতুন কাপড় পাগড়ি করে পরিয়ে দিল। সবাই সব বুঝল ঠিকই, কিন্তু ভরসা করে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারল না।

৬

ঠেঙ্গাজানি ক্রমশ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেই সন্তোষকুমারী তাকে সে যত দেখে, সে ততই নতুন ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দেখে দেখে তার আশ মেটে না। সে কিন্তু কাছে আসে না। দূর থেকে তাকিয়ে দেখে। দেখা হলে হেসে চলে যায়। ঠেঙ্গার বুকের ভিতরে ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে থাকে। কোনো না কোনো ছুতোয় সে পিছন পিছন ছোটে, কিন্তু তাকে পায় না।

ধাংড়াঘরে তার আসন্ন বিয়ের কথা তুলে বন্ধুরা তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা শুরু করলে ওর বুকে ছুরি চালানর মতো লাগে। ঘরের ভিতরে গরম লাগে। ধাংড়ীঘরের গান তার কাছে কোলাহল মনে হয়। সে বাইরে যদি কুড়িবার বেরোয় আবার শোবার জন্যে ঘরে কুড়িবার ঢোকে।

ওর মন মানে না। মাঝে মধ্যে ওর মন একটু নরম হয়ে আসে। সন্তোষকুমারীকে ভুলে গেছে মনে হয়। *পানিগাতের* ধার দিয়ে যাবার সময় ওর পা ধীরে ধীরে পড়ে। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে সাতপাঁচ ভাবে। এইরকম ঘোরের মধ্যে ওর দু'তিন দিন কাটে। আবার হঠাৎ সে সন্তোষকুমারীর দেখা পায়। মুচকি হেসে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে সন্তোষকুমারী পিছন ফিরে চলে যায়। ঠেঙ্গাজানি নির্বাক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। মোষের মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শুধু শূন্যে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মনের বিষ কোদাল চালান পরিশ্রমের ঘামেও ধুয়ে যায় না।

পানিগাত — শুক্‌নো নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে জল পাওয়া যায়

চাঁদের আলোয় ভরা এক উদাসী রাত। ধাংড়াঘরের সামনে একটি পাথরের চাতালের উপর ঠেঙ্গাজানি বসে আছে। তার পিছনে একটি বড় বটগাছ। সামনের দিকে জমি ক্রমশ ঢালু হতে হতে নিচে চলে গেছে। এই ঢালুতে নিচের বস্তি, কিন্তু ওপর থেকে কিছু দেখা যায় না। শুধু সরু রাস্তাটি দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে দু'চারটি ঘর বাড়ি, বাঁদিকে কোনো কোনো ঘরের চালা দেখা যাচ্ছে, তার ওইদিকেও ঢাল। এখানে সেখানে দু একটা গাছ। মুরান নদীর ধারে অন্ধকারে ঝাঁকড়া গাছের ঘন বেড়া। এখানে বসে দূরের ক্ষেতগুলি খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায়। কিছু ক্ষেত ঢালে রয়েছে তো কিছু যেন পাতালে রয়েছে। খুব নিচে। তার ওই দিকে লুল্লাগ্রামের সেই গোল ঘেরা পাহাড়মালা।

কুয়াশাভরা চাঁদনী রাতে পাহাড়ের উপত্যকায় আলোর সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে ছোট, বড়, অসংখ্য ঝিল্‌ঝিলে ছায়া যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের উপরে আকাশে গোল চাঁদ উঠেছে। সে যেন হাসছে।

ঠেঙ্গাজানি একলাটি বসে আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। পিছনে ধাংড়াঘর থেকে একের পর এক নাকডাকার শব্দ ভেসে আসছে। হাঁ, পাখির ডাকের মতন শোনাচ্ছে।

চারদিকে গ্রামের রাস্তায় সেই ছুঁচোলো ও চ্যাপটা পাথর ছড়ান রয়েছে। কত পুরুষ ধরে গ্রামের সব লোকেরা যেন পাথর হয়ে গাছের ছায়ায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কেউ জেগে নেই। সব নিস্তব্ধ।

সামনের দিকে তাকিয়ে বসে ঠেঙ্গাজানি আপন মনে কি যেন ভাবে। ওর কোলের ওপর পুরনো লাঠিটি বেঁকা ভাবে রাখা আছে। আর চিন্তাধারা যেন নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। পরিস্থিতির রাগিণী ওর মনকে আশ্রয় করে আপনি বেজে চলেছে। ও যেন জেগে জেগে ঘুমিয়ে সেই রাগিণী শুনছে।

এ এক অলৌকিক রাত। এই পথে কত লোক নেচে, গেয়ে তাদের জীবন কাটিয়ে গেছে। তাদের পায়ের ধুলো একত্রিত হতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের হৃদয়ের কথা কি একত্রিত হতে পেরেছিল? একটু জোয়ারের ফেন ও কন্দ খুঁড়ে খেয়ে কৌপীন পরা মানুষগুলি প্রকৃতির অনাদর ও শত্রুতার মধ্যে নিজেদের ছোট ছোট ঘরকন্নার খেলা সাঙ্গ করে ওই লোকে চলে গেছে। আজ পথ শূন্য। তাদের ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি। শুধু তাদের স্মারক হয়ে এই ছুঁচোল ও চ্যাপটা পাথরগুলি ছড়ান রয়েছে।

কতজনের মনের কথা না বলা থেকে গেল। কতজনের গুপ্ত বেদনা মানুষ শরীরের কারাগারে জীবনভর বন্ধ থেকে শেষে সত্তা হারাল। কোনো দুটি হৃদয় কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে চিনতে না পেরে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াল। খুঁজে বেড়ানোটাই সার হল।

রোদের তাপ, বর্ষার হৃদয় নিঃসৃত জলধারা, ঝড়ঝঞ্ঝার দাপট সব কিছু সহ্য করে বনের মানুষ শুধু তাদের প্রতীক করে রেখে গেছে ছুঁচোল ও চ্যাপটা পাথররাশি।

আজকের এই নির্জন গ্রামের পথে সব অস্থিরতার শেষে পাশাপাশি শুধু পাথরগুলি রাখা আছে যেন শেষ অবসানের দিনের অপেক্ষায়। মুখে তাদের কোনো কথা নেই, হৃদয়েও তাদের আর কোনো হিংসা, ক্লেশ বা ক্ষোভ নেই।

জীবিতাবস্থায় হৃদয়ের ডাকে পরস্পরের সঙ্গে তারা মিলিত হতে পারেনি কিন্তু মৃত্যু তাদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। পাথরে রূপান্তরিত হবার পর ছুঁচোল পাথর ও চ্যাপটা পাথর পাশাপাশি আসতে পেরেছে, কিন্তু এখন আর বুক কেঁপে ওঠেনা, গায়ে শিহরন জাগে না, চোখ আমেজে মুদে আসে না। ওরা শুধু পাথরের পাশে অন্য পাথর হয়ে পড়ে আছে। সংসারটা মনে হয় ধোপাখানা। সেখানে প্রতিদিন নোংড়া কাপড় কাচা হয়। আজকের কাপড় কাল নেই। কাপড়ের যত নোংরা, দাগ ও কালি আর পথের যত ধুলো ময়লা ও বালি সব পরিষ্কার হয়ে জলের সঙ্গে মিশে অনেক দূরে ভেসে যায়। সেই রকম এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া যেন ধোপাখানায় আসা। আছড়ানো হয়ে পরিষ্কার হয়ে আজকের মানুষ কাল ফিরে যায়।

এই নির্জন, নিস্তব্ধ রাতে ঠেঙ্গাজানির মনে হল যেন, ওর কৌপীনপরা, কাঁধে বাঁক বওয়া পেংগ, পরজা পূর্বপুরুষরা পাথরের ভিতর থেকে ছায়া রূপ ধরে বেরিয়ে এসে গাছের চারদিকে হাতে হাত ধরাধরি করে গান গাইতে শুরু করল—

সুড়া, সুড়া (শোন, শোন) সুড়িয়া গোড়ি
ত্তেনা, ত্তেনা (শোন, শোন) সরসা গোড়ি
শোএ দিন্‌পঁ দিনেঁ (একশ দিনের মধ্যে একদিন)
বার মাসতাঁ মাসে (বারমাসে একমাস)
জুড়ি জুড়ি (আমরা দুজনে) মিহা আতাহ্না
ইপর দাদির জাগাতো (এই আমাদের পূর্বপুরুষদের স্থান)
ইপরা মামির গুমাতো (এই আমাদের পূর্বপুরুষদের স্থান)
মলা গলা সাঁসারে (সংসারে)
দোবাদোলা চারে (ধোপার বাড়িতে)
জুড়ি গুড়ি মিহা আতাহ্না।

সেই ছায়াভরা মায়াবী রাতে, ওর বোধের সামনে যেন ভেসে উঠল টক্‌টকে ফরসা, বলিষ্ঠ গড়ন ওর পূর্বপুরুষের ছায়া— গলায় কণ্ঠি, কানে দুল, তেলচুক্‌চুকে খোঁপা, আলোয় ঝক্‌ঝকে হাসিহাসি মুখ। তারা তার কানের কাছে সুর টেনে টেনে গান আরম্ভ করে দিল।

এ হাঁ (সা'''— মা''')
সল-ন-ল (সামাপাধামা)'''
মাঁ কিতি আড় জমা (আমাদের বাবা আমাদের বড় করে তুললেন)

মনি পতেক্
বাবু কিতি গোড় জমা (আমাদের মা আমাদের বড় করে তুললেন)
ইপরা পুরুষ বেড়া
ইপরা বেণ্ডিয়া বেড়া (আমরা জোয়ান হলাম)
ইনাকা দেং চিম্ চিম্ রানাস্ (কেন আমরা চুপ করে থাকব?)
ইনাকা দেং মাড়গুম্ রানাস্ (কেন আমরা চুপ করে থাকব)
আতু বিচি কেলা কিনাস্ (হাত ধরাধরি করে খেলব এস)
গোড়্ জিটি নাচ কিনাস্ (পো আছড়ে নাচব)

ধীরে ধীরে ওই ছায়ারূপগুলি ওর চোখের আড়ালে চলে যেতে লাগল।

কোন অনাদিকালের পুরুষ যেন অতি আবেগ ভরা কণ্ঠে কোন অনাদিকালের স্ত্রীকে ভুংভুঙ্গার তালে তালে সম্বোধন করে আমন্ত্রণ জানাল— "ও সরসাগেড়ি, ও সুড়িয়া গোড়ি তুই আর না।"

রাত্র দরিয়া হোকে কিড়া হোরিআ
হোকে গোড়িআ গড়াই জোটা গড়াই
আরে— রাত্র কবাত্ পুনু আকানি।
সোর্বু পেড়ুয়া আকানি এ সুড়িয়া গোড়ি
এ সরসাগোড়ি আরে আরের (সামাপাধামা)

পাহাড়মালা পেরিয়ে দিগ্‌বলয়ে, পাতার ফাঁকে ফাকে শিশিরের ফোঁটায় ফোঁটায়, জ্যোৎস্নার কণায় কণায় আহ্বানবাণী যেন প্রতিধ্বনিত হল।

মিলনের আমন্ত্রণ জানিয়ে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভরা ডাক "গেড়িয়া গড়াই আয়রে, জটা গড়াই আয়রে।" পাথর থেকে পাথরে যেন সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছুঁচোল পাথর থেকে চ্যাপ্টা পাথরে আবার চ্যাপ্টা পাথর থেকে ছুঁচোল পাথরে।

রূপ পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। রাগিণীর উচ্ছ্বাস রাতের অন্ধকার আর জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেছে। মনে হয় চলে গেছে— সত্যি কিন্তু যায়নি। প্রতি রাতে সে যেন প্রাণ ফিরে পায়। জীবন মরণের সীমানা পেরিয়ে, রাতের আবছা আলোয় পাথরগুলির উপর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। জোয়ার ক্ষেতে ও জঙ্গলে দুলে দুলে ভেসে বেড়াবে বলে, কে যেন অনাদি অনন্ত মানুষের হৃদয়ের ভাষাকে সযত্নে রাতের বাতাসে ভরে রেখেছে। ঠেঙ্গাজানির ঘুম ভেঙে গেল।

নির্জীব পাথর সভার মাঝখানে সে শিশিরভেজা গায়ে একাকী বসে আসে।

উঠে চলে আসবে ভাবছে এমন সময় মনে হল কে একটি মেয়ে শাড়ি খস্ খস্ করতে করতে সামনের ঢালু রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ঠেঙ্গাজানির বুকে যেন আগুনের ছোঁয়া লাগল। এই নিস্তব্ধ রাতে, কেউ কোথাও নেই। কে হতে পারে? ডুমা নয়তো? এই রকম রাতে বুঝি বাঘডুমা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। পিছনে পিছনে তার বাঘও ঘোরে। বাঘডুমা এ নয়, কারণ সে শুনেছে বাঘডুমা সাত আটবছরের বাচ্চা ছেলের মতো দেখতে। তার মুখ লাল, মাথায় লাল রঙের টাক, আর চোখ জোড়া হলুদ বর্ণের। তবে কি এ কোন মানুষের ডুমা?

ওর বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল। ক্ষণিক পূর্বের অনুভূতি মনকে নাড়া দিয়ে গেল।

সে খুব ভয় পেয়ে লম্বা লাঠিটি শক্ত করে ধরে সাহস ভরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

যে আসছিল সে পুরোটা উঠে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফিক্ করে চেনা হাসি হেসে, মুখ নামিয়ে চুপিচুপি বলল— "ভয় পেলি নাকিরে।"

ঠেঙ্গাজানি খুব অবাক্ হয়ে ওর কাছে ছুটে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল— "সন্তোষকুমারী এত রাতে তুই এখানে কি করছিস্?"

"আজ কি নতুন নাকি? তোর খোঁজে কত রাত এইভাবে এখানে এসেছি। এক একদিন ইচ্ছে হয় তাই আসি। ভাবি, দেখি, ঠেঙ্গা কি করছে? তোর কিসের গরজ? তোর নাক ডাকার শব্দ শুনে আবার বাড়ি ফিরে গেছি। আমাদের বাড়ি আর কতই বা দূরে? ওই তো বাঁকের কাছে।"

উত্তেজনায় ঠেঙ্গার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। সে তাকে কাছে ডেকে বলল— "এদিকে আয়, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

সন্তোষ বলল— "না, ওদিকে যাব না। কে আবার ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে। এই রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে। কেউ নেই, এখনি দেখে এলাম।"

সন্তোষকুমারী আর কথা না বাড়িয়ে যে পথে এসেছিল, সেই পথে হাঁটতে শুরু করল। ঠেঙ্গা ওর পিছু নিল। নিস্তব্ধ রাতে ঢালু রাস্তা বেয়ে ওরা চলে গেল।

এর অনেকক্ষণ পরে দক্ষিণ আকাশের শেষ তারাটি যখন ডুবে যেতে বসেছে, ঠেঙ্গাজানি ওকে জিজ্ঞাসা করল— "কাল আবার আসবি তো?"

সন্তোষকুমারী হেসে উত্তর দিল— "এইখানে আসিস্ গল্প করব।"

এই বলে দুজনে যে যার পথে চলে গেল।

৭

রাম নায়কের ঘর তৈরির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। মাটি মাখা হচ্ছে। অনেক ছোকরা ছুকরী কাজে লেগেছে। মজুরী বাবদ তার দৈনিক দুই পোয়া জোয়ার ও একটু রান্না করা মদ খেতে পায়।

রাম নায়ক ছেলে ঠেঙ্গাকে ঘর তৈরির তদারকির কাজে বহাল করে, নিজে আর একদল মজুর নিয়ে ঝরনার ধারে আল বেঁধে নতুন ক্ষেত তৈরি করে চলেছে।

মাঝে মাঝে রাম নায়কের মনে হয় ওর মতন সুখী বুঝি এ জগতে আর কেউ নেই। ছোট বেলায় সে খুব গরীব ছিল। অল্প বয়সে বাবা মা দুজনে তাকে ছেড়ে চলে যান। একটু বড় হবার পর অন্যের জমিতে চাষের কাজ শুরু করে। ক্রমশ কঠিন পরিশ্রম করে সে ধান ও জোয়ারে খামার ভরে ফেলে। গরু বাছুর কেনে, নিজের জমি কেনে— সেই জমিতে আরো খেটে সোনা ফলায়। ভাগ্য তার উপর খুব প্রসন্ন।

গায়ের শক্তিতে সে যখন গ্রামের অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেল, সম্পত্তি কিনে ধনী হল, তার খুব নামডাক হল, ঠিক তখন তার কাকা অপুত্রক বুড়ো হরিনায়ক মারা গেল। তখন আমিন্ রিবিন্যু তাকে গ্রামের নায়কের পদে নিয়োগ করলেন।

সেইদিন থেকে একরকম সুখেই তার দিন কাটছে। ওর ভাগ্যে মেয়ে জন্ম হয়নি। মেয়ে থাকলে পণ বাবদ কিছু টাকা তার ঘরে আসত। অবশ্য এর জন্যে তার তেমন ক্ষোভ নেই। তার ছেলে ঠেঙ্গা আছে। সে তার বৃদ্ধ বয়সের গর্ব। সেই তার টাকার গাছ।

খুব ছোটবেলা থেকে ঠেঙ্গা তার গুণের পরিচয় দিয়েছে। সে বাবার মতো পরিশ্রমী ও সদাশয়। মাত্র আটবছর বয়সে সে বাবার গরু পাহারা দিতে শুরু করে। বার বছর বয়সে ক্ষেতে লাঙ্গল চালায়। পনের বছর বয়সে সে যেন বাবার সংসারের আধখানা।

নিজের থেকে এগিয়ে গিয়ে মজুর খাটানো, ঝড়বৃষ্টিতে জঙ্গলের আনাচ-কানাচ থেকে খুঁজে পেতে প্রতিটি গরুকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা, নিজে সব কাজের দায়িত্ব নেওয়া, সব সে করবে। এইরকম গুণবান ছেলে ঠেঙ্গা, তার নিজের ভালমন্দ নেই, সুখদুঃখ নেই, বাবার সংসারে উন্নতি করতে দিনরাত সে কলের যন্ত্রের মতন খেটে চলে।

বাবা কিছু জিজ্ঞাসা করলে, ছেলে বলবে— "তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি আবার কি বলব?"

এমনি সুপুত্রের বিয়ের জন্যে রাম নায়ক খুব যত্ন করে ধীরে সুস্থে ঘর তৈরি শুরু করেছে। মাঝে মধ্যে ক্ষেতের বিলের কাজ জনমজুরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরের সামনের পাথরটার উপর বসে হাঁকডাক শুরু করে। নিজে হয়তো বাঁশ চিরতে লেগে যায়, বা মাখামাটি বয়ে আনে। কখনো বা পিকা টানতে টানতে চুপটি করে বসে কাজ দেখে।

৮

প্রচণ্ড রোদে গায়ে কালো কোট পরে, কাঁধে চাদর নিয়ে গুরুরা খ্রীষ্টধর্মের সন্দেশ একগ্রাম থেকে আর একগ্রামে প্রচার করে বেড়ান। দর্‌দর্ করে ঘাম ঝরছে, হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা করছে কিন্তু কাউকে দেখলেই শুদ্ধ ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ— যীশুর বাণী প্রচার— "প্রভু পরমপিতাকে বিশ্বাস কর। তাঁকে সর্বদা হৃদয়ে ধ্যান কর। তিনি নিজের প্রিয় পুত্রকে সংসারের পাপ পরিত্রাণের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন।" রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যতই কষ্ট হোক তাদের ঘুরতেই হয়। সাহেব বলেছেন— না হলে তারা মাইনে পাবে না। পিণ্ডাপদর গ্রামের শান্ত মূর্তি সলমন গুরু শুভবারতা শোনানোর জন্যে বারম্বার এই অঞ্চলে আসেন। তাঁর অটল ধর্মবিশ্বাস চক্‌চকে কপাল থেকে যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। বিদেশী ধর্মের সুসমাচার বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। দাদিবুঢ়ার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ের যায়। হুঁকাবুঢ়া মাথা তোলে না।

মাঝরাতে এই শুদ্ধভাষায় খ্রীষ্টান চোরেরা দাদিবুঢ়ার কাছে প্রার্থনা জানায়— "হে পরমপিতা, দাদিবুঢ়া, তুমি বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর আমাদের মনে কোনো কুটিলতা নেই। সত্যি বলছি শুধু অভাবের জন্যে দুর্যোগের রাতে কারুর গোয়াল থেকে গরু, কারুর শোবার ঘর থেকে একখানা থালা চুরি করে এনে আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালন করে থাকি। কিন্তু পুলিশ স্টেশানের লোকে এবং এই সভাইনসিপিটি বাবুরা সবাই বিধর্মী— ধর্মে বিশ্বাস করে না। তারা আমাদের দুঃখ বোঝে না— শুধু তুই আমাদের দুঃখ বুঝিস্।"

এলিও, জোহন্, আলিহন্দর, পিতর, সিমন্, ফাউল, মিকাল এইরকম তারা যতজন সকলেই এই ধর্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু শুধু বিশ্বাসে তাদের চলবে না। অনুতাপ করতে, দোষ স্বীকার করতে, সলমন গুরু বই থেকে তাদের যা কিছ শেখাচ্ছেন, কাচারী, আদালতে বা সমাজের ব্যবহারিক জীবনে তার মূল্য কতটুকু? একবার ধরা পড়লে কোনো গুরু বা পাস্টর তাদের রক্ষা করতে পারবে না। নিরাকার আকাশী দেবতা মানুষের পাপের বোঝা বহন করেন— একথা ভাল। সুসমাচারে বলে যাদের তিনি ক্ষমা করেন, তাদের সব পাপের বোঝা তিনি মাথা পেতে নেন। যে যেমন ভাবে চলুক না কেন একদিন না একদিন তাঁর রক্তে সকলের পাপ স্খালন হবে।

তাই তারা নির্বিকার ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে। যখন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে তখন সাকার দেবতার প্রয়োজন হয়। তারা তখন গুরু ও পাষ্টরের দৃষ্টি এড়িয়ে দাদিবুঢ়া ও ঝাকর দেবতার কাছে মানত করে, পুজো দেয় ও বলি দেয়। এইভাবে দুইদিক রক্ষা করে তারা সংসার কার্য সমাধা করে।

সন্তোষকুমারী এই বিশ্বাসের ভিতর বড় হয়ে উঠেছে। নিজেদের মণ্ডলীর মধ্যে সভা ডাকা হলে, সকলের সঙ্গে মিলে দিশী দেবদেবীকে প্রেত আখ্যা দিয়ে, শয়তানের অনুচর বলে গালাগালি দেয় ঠিকই, কিন্তু নিজের ঘরের নির্জনতায়, নিজের প্রয়োজনে সে ঠাকুর দেবতার কাছে ধরনা দেয়। এতে তার মনের বল বাড়ে।

সন্তোষকুমারী শুধু দাদিবুঢ়াকে নয় হুঁকাবুঢ়াকে অমান্য করে না। ঘটনা স্রোতে রামনায়কের ছেলে ঠেঙ্গাজানি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সে নিজে আশ্রয় পেয়েছে,— এ খুব ভাল কথা, কিন্তু আরো অনেক কাজ যে বাকি আছে, সে মনে মনে বলে, "দাদিবুঢ়া, সব তোর দয়া।" এক একদিন সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে সে একটা দাদিবুঢ়ার ঢিপির উপর উঠে আসে, শুকনো তালপাতা জড়ো করে দাদিবুঢ়ার খানিক দূরে আগুন জ্বালায়। নিজের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে, প্রার্থনা জানায়— "দাদিবুঢ়া, সর্বদা আমার কথা মনে রাখিস্ আমাকে দয়া করিস্।" এইসব শুনে সাত খাঁজ কাটা দাদিবুঢ়া অন্ধকারের মধ্যে মুচকি হাসে। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে নিস্তব্ধ ঢিপির উপরে সন্তোষকুমার দাদিবুঢ়াকে আলো দিয়ে আসে।

এদিকে কিন্তু সে ঠেঙ্গাজানিকে ছট্‌ফট্ করে মারে। দেখা দিয়ে হেসে চলে যায়। কথা বলে না, কিন্তু একবারও চোখ তুলে তাকায় না। শুধু খোঁপায় ফুল গুঁজে শরীর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চলে যায়।

ঠেঙ্গাজানি গুম্ হয়ে থাকে। রাম নায়ক সারিয়াদানকে বউ করে আনতে প্রস্তুত হতে থাকে।

৯

রাম নায়ক তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে শুরু করল। কন্যা চাইতে গেলে প্রথমে পাঁচ বোতল মদের প্রয়োজন, সে না হয় যখন খুশি গিয়ে কিনে আনা যেতে পারে। আরো পাঁচ হাঁড়ি লন্ধা মদ তৈরি করতে হবে। এরজন্যে সাতদিন আগে থাকতে জোয়ারের ফেনকে পচাতে হয়, না করলে ভাল নেশা জমে না। শুধু এতেই হবে না, কন্যার জন্যে একখানা ভাল শাড়ি, নাক বা কানে পরবার জন্যে সোনার গয়না দু'একখানা চাই। এরপরে দিশারি দিন ধার্য করে দেবে। কোনদিন শুভ? কবে মনের আশা পূর্ণ হবে? সেই রকম দিনক্ষণ বুঝে, কন্যার বাড়ি গিয়ে পাঁচ পঞ্চায়েতের সামনে কথাটা

পাকা করতে হবে। শীত চলে যাচ্ছে। কুয়াশা কেটে যাবে। চারিদিকে পরিষ্কার দেখাবে। বন জঙ্গল নতুন কচিপাতা ও ফুলে ভরে যাবে। এই শীতের শেষে প্রথম বসন্তে ধাংড়া-ধাংড়ীদের মনে রং ধরে। তাই তার আগে, অভিভাবকেরা কন্যামাঁগনি করে বিয়ের কথা পাকা করতে পারলে ভাল হয়।

ক্রমশ সেই দিনটি এগিয়ে আসছে। বাবার হুকুম অনুযায়ী ঠেঙ্গাজানিকে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ও মনের কথা মনেই চেপে রেখেছে। কোনো কোনোদিন ওর সৌভাগ্য হলে নির্জন রাতে ওর সন্তোষকুমারীর সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। এইটুকুকে সম্বল করে কলের মতো ঠেঙ্গাজানি কাজ করে চলেছে।

এদিকে রাম নায়ক কন্যামাঁগনি করতে যাবে এ কথা সারাগ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সারিয়াদানের বন্ধুরা রোজ তাকে স্নান করিয়ে, নতুন নতুন সাজে সাজাতে শুরু করেছে। ওর বাবা হাট থেকে গলায় পরবার জন্যে ছড়া ছড়া পুঁতির মালা, আঙুলের গাঁঠে গাঁঠে পরবার পিতলের ঢালাই করা আংটি কিনে এনে দিয়েছে। গায়ে হলুদ মেখে, স্নান করে, নতুন শাড়ি অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে, নিজের দিকে সচেতন দৃষ্টি মেলে, সারিয়াদান গ্রামের পথে গুটি গুটি হাঁটে। যদি কখনো ঠেঙ্গার সঙ্গে দেখা হয় লজ্জায় মাথা নিচু করে, আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসে।

ঠেঙ্গার বন্ধুরা এই নিয়ে ওর সঙ্গে খুব রসিকতা করে। সেও ওদের ঠাট্টা উপভোগ করছে, খুব আমোদ পাচ্ছে ভান করে, কিন্তু ওর মনের মধ্যে সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

সে নিজের মনে সারিয়াদানের সঙ্গে সন্তোষকুমারীর তুলনা করে। যদিও সারিয়াদান সুন্দর ও লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু সে গরুর মতো বড় সহজ ও সরল। তাই ওর মনে দাগ কাটতে পারছে না। সন্তোষকুমারী সব দিক দিয়ে চৌকস মেয়ে। সে যেমন জ্বালাতে পারে তেমনি কাছেও টানতে পারে। তাই সে সর্বদা কাম্য।

যখনি ঠেঙ্গাজানি ভাবে সে সারিয়াদানকে বিয়ে করেছে, সন্তোষকুমারী ওর কেউ নয়— পরস্ত্রী, তখনি ওর মনের মধ্যে ঝড় উঠে সব কিছু উড়িয়ে নেয়। শূন্যতা বোধ ওকে গ্রাস করে। ও উদাস হয়ে যায়। সে চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতে পারে না। হঠাৎ সন্তোষকুমারীর দেখা পাবে ভেবে ওদের পাড়ার কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে। এই বুঝি সন্তোষকুমারী ঘরের বাইরে বেরুবে।

সেদিন খুব অন্ধকার রাত ছিল। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝরাতে শীতে হাড় কেঁপে যাচ্ছিল। তিন সপ্তাহ পরে সন্তোষকুমারী ও ঠেঙ্গাজানির আবার দেখা হল। সন্তোষকুমারী সোজাসুজি ঠেঙ্গাকে প্রশ্ন করল— "ঠেঙ্গা, আর কেন? আর কতদিন বা? তোর জন্যে কন্যামাঁগনি হতে চলেছে। আর কদিনবাদে তুই সারিয়াদানকে নিয়ে সুখে ঘর করবি। এই লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার কি দরকার?" সন্তোষকুমারী যদিও ঝগড়া করতে এসেছিল, ওর ধীরে ধীরে বলা কথাকটি ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বাসের সঙ্গে

মিলে মিশে বনের গভীরে প্রবেশ করল। কান্নায় ওর গলার স্বর বুজে এল। সে আবার বলল— "তুই বলছিস বাবা জোর করছে— তোর মুখে কথা নেই কেন? তুই না পুরুষ মানুষ। থাক্, থাক্, আমারই বা কেন তোকে উপায় বাতলে দেওয়া? তুই তোর সুখের পথে যা, আমার বলার কিছু নেই। আমি আগে তোকে অনেক বারণ করেছি। এইরকম দেখায় কোনো লাভ হবে না। আমাদের জাত ভিন্ন। যোগাযোগ না হবার কথা। আমাদের বাপঠাকুর্দার আমল থেকে এ রীতি অচল বৃথা এসব আলোচনা। তুই তখন কিছুতেই শুনলি না। এখন তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল, কিন্তু আমি জানি, তুই এখন বাবা মার সুপুত্র হয়ে, আমাকে পায় মাড়িয়ে বিয়ে করা বউকে নিয়ে সংসার করবি। আর আমাদের এমন অবস্থা বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারব না।"

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সন্তোষকুমারী চলে গেল। কিন্তু ঠেঙ্গার বুকে রেখে গেল ঘোর অশান্তি। ভয়ঙ্কর সেই অশান্তি যেন খালি আছাড়ি পিছাড়ি খায় ও বাইরে বেরুবার পথ খোঁজে।

বাবা মাকে দু'চারটে কড়া কড়া কথা বলতে পারলে বা বুড়ো নায়কের গোঁফগুলি টেনে তুলে ফেলতে পারলে ওর প্রাণ শান্ত হত। নিজের খুশিতে, নিজের ভালমন্দ সে বেছে নিতে পারত। কিন্তু যেখানে বিপক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই সেখানে রাগ করা নিষ্ফল। সেখানে শুধু আর দুঃখ নিজের প্রাণকে পুড়িয়ে অঙ্গার করে। বাবা মা তার সুখচিন্তায় মগ্ন। তার বিয়েটা তাড়াতাড়ি হতে পারছে না বলে তাদের দুজনের মনে অশান্তি। তাদের আনন্দে মাটি গোবরজল ঢেলে দিতে ওর হাত ওঠে না। সে মনে মনে পিছিয়ে যায়। তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে ঠেঙ্গাজানিকে এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু মনের মধ্যে চাপা কান্না গুম্‌রে মরে! আর যা অস্থিরতা। ওঃ।

ঠেঙ্গাজানি খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বসেছে তো বসেই আছে। খেতে ইচ্ছে নেই। সারাদিন একতাল মাটির মতো পড়ে আছে। সন্ধ্যা হলে হঠাৎ কে যেন ওই মাটির দলায় প্রাণশক্তি ভরে দেয়। কালের মতন সে ঘুরে বেড়ায়। সমাজের বাঁধাধরা গতের বাইরে বেরিয়ে যাবার উপায় তার নেই। সে শুধু নিজেকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে— আর তার মনের গভীরে সাত পাঁচ চিন্তা পাক খেতে থাকে— উপায় কোথায়? উপায় কোথায়?

মা বাবাকে বলে— "কেন এই কদিন হল, আমার ছেলে মনমরা হয়ে থাকছে?"

বাবা বলে— "কই না তো। যে বিয়ে করতে চলেছে সে কি কখনো মনমরা হয়ে থাকতে পারে? ভালই তো আছে।" খাচ্ছে, দাচ্ছে, ডুংডুঙ্গা বাজিয়ে গান গাইছে। এই তো ধাংড়ার কাজ। কে বলেছে সে মনের দুঃখ আছে? ঠেঙ্গার মার বিশ্বাস হল না। সে শুকনো মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল— "আমার কি মনে হচ্ছে জান,— ওর মনে অন্যকিছু ঢুকেছে। যে কথা সে আমাদের কখনো বলবে না। সারিয়াদানকে বউ

করে আনব খুব ভাল কথা, কিন্তু ছেলে কি ষোলআনা মত দিয়েছে? সারিয়াদান কি তার আপন? তুমি এ নিয়ে কিছু ভাবছ? যদি অন্য কেউ? বাবা আর তাকে কথা বাড়াতে দিল না। অনেক যত্নে সে বিয়ের ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছে, এর মধ্যে সন্দেহের ছায়া পড়তে দিতে ওর মন চায় না। সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল— "জানির মেয়ে কন্যা হিসাবে খুব ভাল। ভাগ্যে থাকলে এমন মেয়ে লোকে বউ হিসাবে পায়। ঠেঙ্গার ওকে অপছন্দ? আমরা কি জানি? আমরা ওকে নিজের জন্যে কনে পছন্দ করতে বারণ করিনি। আমরা যা ভাল বুঝেছি, তাই ঠিক করেছি। ওর যদি অন্য কাউকে পছন্দ থাকে বললেই পারে— সে তো আর মেয়ে মানুষ নয়। বলছে না কেন? তার সরল বিশ্বাসে বলা কথায় ঠেঙ্গার মার মনের সন্দেহ দূর হল। তার দেহ যেন প্রাণ ফিরে পেল। রাম জানি এমনি সরল প্রকৃতির মানুষ। তার আত্মবিশ্বাস ফুলের পরাগের মতো বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে নিজের মানুষের মনকে রাঙিয়ে দেয়।

ক্রমশ দিনটি কাছে এল। ভোরবেলার মুরগীর ডাক, গরুর হাম্বাডাকের মধ্যে দিয়ে, অন্ধকার রাতের ভিতর থেকে সেই দিনটির সূচনা হল— যেদিন রাম নায়ক কন্যামাঁগনি করতে যাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাম নায়ক দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। যদিও সে গ্রামের নায়ক তবুও ওর বাড়ির উৎসবে, অন্য পাঁচসাতজন ধনী রায়েতদের আসতে না সাধলে হয় না। পলিদাগ্রামে লোক পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে বন্ধুবান্ধবরা আসছে, বড় দূরের পথ, তবুও তারা আসবে।

ঠেঙ্গার মা সারাদিন ঘরদোর লেপাপোছা নিয়ে ব্যস্ত। সকলে খেটে যাচ্ছে শুধু দেখা নেই ঠেঙ্গার। বাবাকে বলে সকাল থেকে গরু চরাবার ছুতোয় ও জঙ্গলে গেছে। এত বেলা হল, ওর কিন্তু দেখা নেই।

বাবা মাকে বলল— "ছেলের কাণ্ডটা দেখেছিস্? আজ এত কাজ, আমি খেটে মরছি, সাহায্য করা দূরে থাক্, মনের সুখে সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?" মা স্বামীকে উপহাস করে বলল— "সত্যি কথা— ওর বিয়ে যখন, ওর নিজের কুটনো কোটা থেকে মশলা বাটা যাবতীয় কাজ করা উচিত ছিল। তা না করে, বাবা-মার উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে— একি সামান্য কথা?"

দুজনে হাসাহাসি করল। অন্যসময় নির্লজ্জ হলেও বিয়ের সময়ে একটু লজ্জাভাব ছেলেদের মানায়। উপযুক্ত বয়সের ছেলে, বাবামার পায়ের তলায় মাথা নুইয়ে না থাকলে, এত কষ্ট করে ছেলের জন্ম দেওয়া বা তাকে বড় করে তোলা সব বৃথা। ঠেঙ্গা ঠিকই করেছে। ওর পূর্বপুরুষরা এতদিন যা করে এসেছে, ও তাই করছে।

ভর দুপুরবেলায় নির্জন মরীচিমাল জঙ্গলের ঢালে ঝরনার ধারে একটি পাথরের চাতালের উপরে ঠেঙ্গাজানি গুম মেরে বসে আছে। গরুরা চারিদিকে চরে বেড়াচ্ছে।

আজকে তার বিয়ের পাকাকথা দেবার দিন, তার খুশি হবার কথা, কিন্তু খুশি হতে পারছে কোথায়? শীতের দুপুরে রোদে গা চড়চড় করে, ছায়ায় বসলে ঘুম পায়, আর ঝিমুনি ধরে— মাথার ভিতরে হাল্কা লাগে। আজ সকাল থেকে তার কারুর সঙ্গে কথা বলেতে ইচ্ছা করেনি কিন্তু এই নির্জন জঙ্গলে এসেও সে শান্তি পাচ্ছে না। ওর নিজের উপরে খুব রাগ হচ্ছে। মিছামিছি খানিকটা চেচাঁমেচি করে ছড়ি দিয়ে গরুগুলোকে অকারণ পিটিয়ে দিয়ে এল। তারা পাথরে উপরে কিছুটা ছুটে গিয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে নির্বোধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তাতেও ওর মনের জ্বালা মিটল না। সে নিজেকে অতি দুর্বল মনে করল। বাবা মার বিরুদ্ধাচরণ করা ওর কল্পনার বাইরে, অথচ সমাজের গতানুগতিক ব্যবস্থা যা তার বাবা তার ভালর জন্যে করতে যাচ্ছে তাতে তার প্রাণের ভিতর থেকে আক্রোশ।

এইভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। আজকে দুনিয়ার সকলের আনন্দের দিন। তার দিকে তাকিয়ে মাঝে মধ্যে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সকলে দাঁত বার করে হাসছে। সেই হাসির অর্থ একমাত্র সে— ঠেঙ্গাজানি বোঝে। অন্য সকলে কেবল সেই হাসির নিমিত্ত মাত্র। পাখিরা আনন্দে উড়ে যাচ্ছে, গরুরা তাদের খুশিমতো ঘাস খাচ্ছে। বনের লতাও যেন ফুলের বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সে শুধু চুপ্‌চাপ্ নির্জীব হয়ে একতাল মাটির মতন পড়ে আছে। আর তাকে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, তার অস্তিত্বের উপর চোলাই মদ ও রান্না করা মদ ঢেলে বিরাট ভোজের আয়োজন করে মহোৎসবে মেতে ওর বাবা, মা এবং গ্রামের অন্য সব ভাই বন্ধুরা ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।

বেলা বয়ে গেল। ঠেঙ্গাজানি ঘোলাটে চোখে শূন্যদৃষ্টি মেলে আমগাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে। এমন সময় সরু পায়েচলা পথে জঙ্গলের আড়াল থেকে চক্‌চকে খোঁপা দেখা গেল। এখানেই শেষ নয়। ঠেঙ্গাজানি উঠে বসে ওইদিকে ওইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ক্রমে সন্তোষকুমারীর মুখখানি দেখা গেল। চম্‌কে উঠে, চিৎকার করে, ঠেঙ্গা ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এগিয়ে গেল।

"কিরে, তুই এখানে? আজকে তোর বিয়ের মাঁগনি আর লুকিয়ে লুকিয়ে তুই এখানে কি করছিস?" সন্তোষকুমারী এই বলে হাসল। ওর সেই হাসি ঠেঙ্গার বুকের ভিতরটা গুঁড়িয়ে দিল। সন্তোষকুমারী আবার নিষ্প্রাণ হাসি হাসল, খালি ঠাট্টা, ঠেঙ্গাজানির চোখ জলে ভরে গেল। সে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"আহা, হা, ছোট্ট ছেলে, কাঁদছ কেন? মুখটি শুকিয়ে গেছে। বাবা বুঝি খেতে দেয়নি?" হাসতে হাসতে সন্তোষকুমারী ঠেঙ্গাজানির মুখটি তুলে ধরল। একে অপরের দিকে তাকিয়ে থেকে, শেষে দুজনেই কেঁদে ফেলল। এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে লতার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মধ্যে গরুদের খস্ খস্ আওয়াজ শোনা

যাচ্ছে। সূর্য ঢলে পড়েছে। দুজনে দুজনকে কাছে পেয়ে যেন কিছুটা শান্ত হল। ঠেঙ্গাজানির ঠোঁটে সন্তোষকুমারীর নোন্‌তা চোখের জল ও সন্তোষকুমারীর গালে ঠেঙ্গার নাকের জল। তখন ঠেঙ্গাজানি প্রতিজ্ঞা করে বলল— "যে যা বলে বলুক, আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।" সন্তোষকুমারী এর কিছু উত্তর দিল না।

ঠেঙ্গাজানি আবার বলল— "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জাতের লোকেরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে, এই তো, তখন আমরা অন্য গ্রামে, যেখানে আমাদের কেউ জানে না কেউ চেনে না, সেখানে চলে যাব। সেখানে শুধু তুই আর আমি কোনো বনের ভিতরে থাকব। ডাল পালা দিয়ে একখানা ছোট্ট *বাল্‌শা* তৈরি করব, চারিধারটা একটু পরিষ্কার করে নেব। কাছে জলের একটি ধারা থাকবে। সেইখানে আমরা থাকব। কে আমাদের কী করবে। চল এক্ষুনি চলে যাই।"

ওর উৎসাহ এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে সন্তোষকুমারী বলল— "তুই কি পাগল হলি নাকি? বল দেখি, এই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে আমাদের জাতের লোকেরা আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না। একদিন পাবে না, দুদিন পাবে না, তাই বলে তারা কি ছেড়ে দেবে? খুঁজতেই থাকবে। যদি বা আমরা অন্য কোনো তালুকায় বা গ্রামে কোনো মতে লুকিয়ে পালিয়ে যাই সেখানে শুধু ডালপালা দিয়ে একখানি কুঁড়েঘর করে নিলেই কি বেঁচে থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে? পয়সা কই? জমি কোথায়? পরনের কাপড় কই? খাবই বা কি? তার উপরে লোক জানাজানি হলে কি লজ্জা! কি ঝামেলা! না, না এ হয় না। আমরা পাগল হয়ে গেছি, কিছু হবার নয়।"

এই বলে সন্তোষকুমারী কাঁদতে লাগল। ঠেঙ্গাজানি একটু শক্ত হবার চেষ্টা করল। সাহস ভরে বলল— "শুধু কান্নাকাটি করলে হবে না কুমারী; একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। চলে যাব, যেখানেই হোক যেতে হবে।" আবার বাচ্চাদের মতন জিজ্ঞেস করল— "বল দেখি, কোথায় যাওয়া যায়?" সন্তোষকুমারী বলল— "একটা জায়গা আছে— আসাম— চা বাগানের কুলি।" "আসামে যাব কুমারী, সে যে অনেক দূর।"

"আর কোথায় যাব?"

"নিজের দেশ ছেড়ে, তুই আমার সঙ্গে এতদূর দেশে যাবি?"

"কেন যাব না বল্ তুই একল তো আর যাচ্ছিস না— আসাম যাব, আসাম ডিপোতে গিয়ে বলব, আমাদের দুজনের জাত পরজা আর আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি পরজা ধাংড়ীদের ঢংএ শাড়ি পরে নেব। কত দেশ দেখব, পয়সা রোজগার করব। সেখানে যতদিন ভালো লাগে থাকব, তারপর টাকা পয়সা জমিয়ে

বাল্‌শা— কুঁড়েঘর

ফিরে এসে কোরাপুট বা জয়পুর যে কোনো শহরে জমি বাড়ি কিনে থাকব। এর মধ্যে অনেকদিন কেটে যাবে, তখন কে আমাদের কি করবে? এই একটি উপায় ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসছে না।''

''যাব, যাব, আসাম যাব কুমারী, ঠিক আছে, যাব... কবে যাব তা হলে?''

''কাল ভোর না হতে উঠে পালাব। তুই ধাংড়াঘর থেকে খুব ভোরে উঠে আসিস্। আমি রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে থাকব। তারপর দুজনে একসঙ্গে পালাব।''

নতুন উত্তেজনায় ঠেঙ্গাজানির পুরো পরিকল্পনাটা খুব উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। সে বলল— ''আচ্ছা, তাই হবে।''

১০

সেদিন সন্ধ্যায় রাম নায়ক ''কন্যামাঁগনি'' উৎসব শেষ করে বাড়ি ফিরল। পাঁচ হাঁড়ি রান্না করা লন্ধা মদ ও পাঁচ বোতল চোলাই মদ দিয়ে সম্বন্ধীর সঙ্গে কথা পাকা করা হল।

পাঁচ পঞ্চায়েতের সামনে কন্যার পিতা জানি সারিয়াদানকে জিজ্ঞাসা করল— ''ওগো কন্যে; এ অঞ্চলের নায়ক তার ছেলে ঠেঙ্গাজানির জন্যে তোকে চাইতে এসেছেন। আমরা পরজা জাতির সকলে স্বাধীন, মনে মনে কেউ কারুর মজুর বা চাকর নই। তোর ওই ছেলেকে বিয়ে করবার ইচ্ছা থাকলে রাজি হবি না হলে ওদের লন্ধা মদ ও চোলাই মদ সব হাতে হাতে ফিরিয়ে দেব। ঠেঙ্গাজানি গ্রামের ছেলে, তোর অচেনা নয়। তুই তোর মনের কথা বলে দে।''

মুখ নিচু করে, ঠোঁটের কোনায় হাসি চেপে সারিয়াদান বলল— ''আমার মনে আর কারুর কথা নেই। আমার বাবা মার যা ইচ্ছা, আমারও তাই।'' চারিদিক থেকে আনন্দ কলরব উঠল।

পঞ্চায়েতের সভ্যরা বলতে লাগলেন— ''কি লক্ষ্মী মেয়ে; কি লক্ষ্মী মেয়ে; কি লক্ষ্মী মেয়ে!'' এই বলে কেউ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে, কেউ বা চিবুক তুলে ধরে আদর করতে লাগলেন।

রাম নায়ক ওকে জড়িয়ে ধরে, অনেক আদর করে বলল— ''আমার মা যেন সোনার প্রতিমা, তোকে ফুলের মতন সাজিয়ে রাখব। আমাদের ঘরবাড়ি সব তোর। বুড়োবুড়ি বলে আমাদের যেন ভুলে না যাস্। একটু একটু ফেন অন্তত দিবি।''

অতি আনন্দিত মনে রাম নায়ক হৈ হৈ করতে করতে বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি ফিরল। আজ তার ফুর্তির দরকার। সে আজ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেছে। ছেলের জন্ম দিয়েছিল, আজ তার বিয়ে ঠিক হল। তার সব দায়িত্ব শেষ। সে যে গাছটি পুঁতেছিল, তাতে আজ ফুল ফুটছে।

ওর কাজ কি সত্যি শেষ হয়েছে? পরজাদের কাজ শেষ হয় না, তারা অমর ঠিক এই ধরিত্রীর মতন, তারা চির নূতন, তারা চির স্বাধীন। বাড়ি ফিরবার পথে বন্ধুদের সঙ্গে রাম নায়ক মদের হাঁড়ি তুলে ধরে, তাতে চুমুক দিয়ে মদ খেয়ে মাঝ পথেই মাতাল হয়ে গেল। সে সব ধাংড়া-ধাংড়ীদের চিৎকার করে ডেকে বলল— ''এস, এস, আজ সকলে মিলে নাচি গাই আনন্দ করি। বাজনদার; তোরা বাজনা বাজা, মহুরীতে, ভেরীতে ফুঁ দে, ঢাক পেট্।'' ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগল। সকলে এসে জড়ো হল। গোষ্ঠীর একজনের আনন্দে সকলে ভাগ নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। ধাংড়াঘর থেকে ডুংডুঙ্গার টুং টাং শোনা গেল। ধাংড়ীরা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার খাবার খেয়ে নাচের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করল।

সেই সন্ধ্যায় গরুর পালকে সঙ্গে নিয়ে ঠেঙ্গাজানি বাড়ি ফিরে এল। ওর যত্নআত্তি করতে মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। আজ প্রতিদিনের জোয়ার সিদ্ধর সঙ্গে একটু সিমের তরকারী রান্না হয়েছে। ঘরে লন্ধা মদও আছে। ''খা, বাবা, খা, এই রোদে সারাদিন লজ্জায় কোথায় লুকিয়ে ছিলি? খিদেতে তোর পেট চুপ্‌সে গেছে, মুখে জল নেই।''

নাচ শুরু হল। ঠেঙ্গাজানি সকালের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ধাংড়াঘরে শুয়ে রইল। দু-চারখানি জামা কাপড়ে একটি পুঁটলি করে মাথার নিচে রেখেছে। এছাড়া সঙ্গে নিয়েছে দুটি টাকা, খানিকটা সিদ্ধ জোয়ার ও নিজের ডুংডুঙ্গাখানি।

রাতের এত নাচগান মহোৎসব, সব তাকে সংসারে বেঁধে রেখে কাঁদাবার ব্যবস্থা। বাবার স্নেহ, মার চোখের জল সব তার বন্ধনের মতন ঠেকছে। আজকের এই রাতটি যেন একখানি বড় জাল, তার ভিতরে ছোট্ট বনের পাখির মতো সে আটকে আছে। কাল সকাল হলেই— জাল উঠে যাবে— কাল সকালেই সে মুক্ত।

সারারাত ঘুম নেই, কেমন যেন একটা নেশা একটা ঘোরের মধ্যে ও হাবুডুবু খাচ্ছে। কল্পনায় সন্তোষকুমারীকে নানা অপরূপ সাজে দেখতে পাচ্ছে। ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা ভাবে যেন ওর চোখের সামনে বাসছে। এইসব রক্তমাংসের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ক্রমে একটি ভঙ্গিমা— তার হাসি, তার কেশসজ্জা নিয়ে সম্পূর্ণ মানুষটির আকার নিল। তার এক একটি ছবি দিগ্‌বলয়ের চারিদিকে চাঁদের আলোয় কুয়াশার মতো ছেয়ে গেল। সে মনে শান্তি পেল, ছবি পেল, মুক্তি পেল। তার সমস্ত স্থূল শরীর উচ্ছ্বাসে ছত্রাখান হয়ে গেল। সে যেন ছায়া পথে একটি শিল্পমূর্তি, তার প্রতিটি কণিকা কেবল আশা উদ্বেগ, আনন্দ সন্তোষভরা এক প্রাণময় অনুভূতি। তার অন্তরের প্রবণতা অন্ধকারের মধ্যে উঁচু টিপির উপরে জ্বালানো আগুনের দিকে ছুটে চলে। সেই আগুন দূরের আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে দেয়— তাতে সুখ আছে, আকর্ষণ আছে। তারই নাম সন্তোষকুমারী। ঠেঙ্গাজানির আর চিন্তা করবার শক্তি ছিল না। সেই মোহের মধ্যে ডুবে শেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মোরগ ডাকার আগে ঠেঙ্গাজানি উঠে পড়ল। জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে কাঁধে

ভুংভুঙ্গাটি থেকে লাঠি হাতে সে বেরিয়ে পড়ল। তখন অন্য কারুর ঘুম ভাঙেনি। সবে আকাশ একটু ফিকে হয়ে এসেছে। গ্রামের কুকুররা সারারাত পাহারাদারী করে ঘুমিয়ে পড়েছে। গোয়ালঘরের গরুরাও ঘুমোচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে ঠেঙ্গাজানি দেখল রাস্তার দুধারে সারি সারি বাড়িগুলিতে সকলে নিঝুম। তার অতিচেনা গ্রামের ঘরবাড়ি, পথ, পথের ধুলোবালি, কুয়াশা ও ধোঁয়ায় ঢাকা। এই গ্রাম— এখানে সে ধীরে ধীরে এত বড়টি হয়ে উঠেছে। মুখে শিশিরের ঠান্ডা ছোঁয়া ওকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ও গ্রামের পথে হেঁটে চলেছে। গ্রাম কথাটির সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কত মুহূর্তের অলস চঞ্চল অনুভূতি। স্বপ্নে হেঁটে যাবার মতো সে ঘোরের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলেছে। কোনো কিছু ভাববার অবসর তার এখন নেই।

মাঝে পথে সন্তোষকুমারী উঠে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে চলতে শুরু করল। সে আজ পরজা মেয়েদের মতো সেজে এসেছে। মাথার উপরে একটি পুঁটলি— মনে হচ্ছে যেন হাটে চলেছে।

একসঙ্গে পা ফেলে পাশাপাশি তারা খুব তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগল। পরস্পরের সান্নিধ্য দুজনের মনের জোর বাড়িয়ে দিল। চিন্তা নেই, ভয়·নেই, এখন শুধু নির্ভয়ে পথ চলা।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে পরিচিত ফলবাগানগুলি পিছনে পড়ে রইল। চেনা নদী, ঝরনা, পাহাড়, টিপি সব ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। ওদের মনে চিন্তা কি ভাবে তাড়াতাড়ি এগোবে। একটি অজানা আশঙ্কা ওদের অস্থির করছে। ওদের পিছনে কেউ বুঝি ধাওয়া করেছে। চিনে ফেলবে না তো? ধরে ফেলবে না তো?

ভোরের কুয়াশা ঢাকা ফিকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ওরা যেন তরতর করে সাঁতরে পালাচ্ছে। ক্রমে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে এল। দূর পাহাড়ের চূড়োয় এখানে ওখানে যে দু একটি তারা দেখা যাচ্ছিল তারাও একে একে ডুবে গেল কোন কোণায়। অন্ধকার সম্পূর্ণ অপসৃত হল। এখন ওদের মুখের সামনে, কাছে শুধু বিস্তীর্ণ বন, তার আনাচে কানাচে ধাপে ধাপে নেমে আসা নদী, ধানক্ষেত। পুরোপুরি আলো হতে ওরা দেখল ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে।

সূর্যের প্রথম কিরণ যখন দেখা দিল, তারা তখন একটা উঁচু পাহাড়ের ঘাটি রাস্তায়। গা থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পথের ধারে গাছের তলায় একটা পাথরের উপর তারা বসে পড়ল। পিছনে কেউ ধাওয়া করেনি। ওদের মনে আশঙ্কা দূর হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বাড়ি থেকে অজানা পথে পাড়ি দেবার উত্তেজনাও অর্ধেকটা কমেছে।

"এই দেখ, কুমারী; ওই টিপির উপরে দাদিবুঢ়া কত কাছে মনে হচ্ছে।"

এক ফালি কুয়াশা সরে গেছে, পরিষ্কার আকাশ, চারিদিক ফরসা দেখাচ্ছে। তারই

নিচে মিলিয়ে যাওয়া ফিকে লাল আলোয় ও সূর্যের প্রথম কিরণে দাদিবুঢ়াকে সত্যি সত্যি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এতক্ষণে তারা বুঝল যে তারা গ্রাম ছেড়ে সত্যি চলে যাচ্ছে। দাদিবুঢ়ার ওই টিপির নিচে এবড়ো-খেবড়ো ঘন নীল রঙের যে ধারা এঁকে বেঁকে নিচে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে, সেইখানেই তো ওদের গ্রাম। সেইখানে তাদের বাবা মা বন্ধু কুটুম্ব সকলে থাকে। তারা কার কাছে কি অপরাধ করেছিল? শুধু স্নেহ, আদর, সোহাগ, আহ্লাদ দেখান ছাড়া আর কি! সেই ওদের পিতৃপুরুষ আমলের গ্রাম যার মাঝ রাস্তায় সাজানো রয়েছে যুগযুগান্তরের স্মৃতি। বটগাছের ছায়ায় ছুঁচোল পাথর ও চ্যাপটা পাথররাশি। ঠেঙ্গাজানির চোখের সামনে তার বুড়ো বাবা, মার ছবি ভেসে উঠল। বাবা কি করছে? মা কি করছে? সকলে কি সব জেনে গেছে? আর নিরীহ মেয়ে সারিয়াদান, যাকে গতকাল সন্ধ্যায় কুলবধূ করা হবে বলে বাবা মা বরণ করলেন? আর সেই আধতৈরী ঘরখানি— যেটা তার বাবা তার সুখের জন্যে ধীরে ধীরে তৈরি করছে? ছেলের বিয়ে হবে— সে সেখানে থাকবে। সন্তোষকুমারী তার খুব কাছে রয়েছে, কিন্তু এদিকে ওদিকে শুধু বন, জঙ্গল— চেনা নেই, পরিচয় নেই, কোনো প্রকার ভরসার নাম অবধি নেই— নিরাশ্রয়তা, অজানা জীবন।

আর সে পিছনে ফেলে রেখে এসেছে আজন্মের নির্ভরযোগ্য আশ্বস্তি, স্নেহের আবরণ— তার বাবা মা ও বন্ধুবান্ধব সকলকে। সূর্য আরো এক বিঘত উপরে উঠে গেছে। দূরে মুরান নদীতে জলের ঢেউ চিক্‌চিক্ করছে। ভুলে যাওয়া গ্রামের স্নেহের পরশমাখা অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতিগুলিকে মনে করিয়ে দিয়ে সে যেন বিকল হয়ে ছুটে চলেছে। ক্লান্ত ঠেঙ্গাজানি দাদিবুঢ়ার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তার পাশে সন্তোষকুমারী। সন্তোষকুমারীর অস্তিত্ব সে ভুলে গেছে। ওর কপালের, কানের পাশের ঘাম শুকিয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু চোখের জল কোনো বাধা মানছে না। চোখের জলে রোদের তাপ লেগে যখন ওর প্রায় অন্ধের মতন অবস্থা তখন সন্তোষকুমারীর ডাকে ওর সাড়া ফিরে এল।

"ওঠ্, এত শীঘ্র কাহিল হয়ে পড়লি? বসে থাকলে বেলা হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছায়, তখন?"

সন্তোষকুমারীও গম্ভীর হয়ে গেছে। এই সকালে এতক্ষণ সে পোষা শুয়োরকে খাওয়াতো। একদিকে ওর নিজের মা অন্যদিকে এই ঠেঙ্গাজানি— কতটাই বা সে তার উপরে নির্ভর করতে পারে? কিন্তু সে পুরুষ নয় স্ত্রী। "বাঃ কি সুন্দর এক থোকা ফুল ফুটেছে"— এই বলে সে ছুটে গিয়ে সেটি ছিঁড়ে এনে নিজের খোঁপায় গুঁজে নিল। ঠেঙ্গাজানির হাত নিজের হাতে জড়িয়ে, ওকে টেনে তুলে বলল— "ওঠ্ ওঠ্, ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলবে না। যেমন করে হোক আজকের মধ্যে কোরাপুটে পৌঁছাতেই হবে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠেঙ্গাজানি উঠে দাঁড়াল। এরপরে পাহাড়ের অপর পিঠ, শুধু ঢাল বেয়ে নামা, এরপরে লুল্লাগ্রামের আকাশটুকুও আর দেখা যাবে না। চড়াইয়ের

সবচেয়ে উঁচু ঢুড়োটায় ওরা উঠে দাঁড়াল। ঠেঙ্গাজানি— দীর্ঘ সোজা দেহ, কাঁধে ডুংডুঙ্গা ও ছোট একটি ভার বওয়া বাঁক, অন্যহাতে বিশাল লাঠি, তার পাশে সন্তোষকুমারী— একহাতে ঠেঙ্গাজানির একটি হাত ধরে আছে মাথার উপরে একটি ছোট পুঁটুলি।

সকালের সেই প্রথম সূর্যকিরণে তারা দাদিবুড়াকে মনে মনে নমস্কার জানাল, অজানা পথের দিকে মুখ করে অকূলের পথিক দুজন ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে চলল।

১১

"কন্যামাঁগনি" অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় রাম নায়ক দাদিবুড়াকে ভুলে যায়নি। তাই সকালে দাদিবুড়ার সামনে পড়েছিল একখানা ভাঙা মাটির সরা— তাতে বাসি ভাত, মাটিতে জায়গায় জায়গায় ভিজে— সেখানে মদ ঢালা হয়েছিল। এক জায়গায় কিছু ফুল, শিশিরে ভিজে তখনো টাট্‌কা রয়েছে। আর পাশে একগাদা মুরগীর লোম ও পালক। এইটুকু দিয়ে রাম নায়ক মনের আনন্দে ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। মানত করেছিল, সব শুভ হোক, সকলের মঙ্গল হোক, আকাশ থেকে মধু বর্ষিত হোক। সকাল থেকে দাদিবুড়ার মুখে মাছি বসেছিল, মাথার উপরে কাক বসেছিল। আর দাদিবুড়া লক্ষ্মীছেলের মতন চেয়ে রয়েছিলেন।

গ্রামের পাহারাদার, গোষ্ঠীর পাহারাদার ঠাকুর তিনি। সকলের লাভ ক্ষতির জন্যে উনি দায়ী। এই জন্যে সকলে ওনাকে এত মান্য করে, এত ভয় পায়। ওনার কাছে এত বাজনা বাজে ও এত উৎসব হয়।

প্রতিদিন সকালে স্ত্রী-পুরুষ সকলে কেউ দাঁতন চিবোতে চিবোতে, কেউবা কলসী কাঁখে এই টিপির নিচ দিয়ে মুরান নদীতে নেমে যায়। প্রত্যেকের কত সুখ দুঃখ। যার ছেলে অসুস্থ হয়েছিল পরে ভাল হয়ে গেছে, যার গরু হারিয়েছিল, পরে খুঁজে পাওয়া গেছে, যার ভাল ফসল ফলেছে, ফল পেকেছে প্রত্যেকের দ্বারা তিনি অভিষিক্ত। অনাদি কালের দেবতা দাদিবুড়া, সকলে তাঁর মহিমা গান করে। আবার এই দলে অন্যরা, যাদের ছেলে আঁতুড় ঘরে মারা গেছে, গরু গোয়াল থেকে চুরি গেছে, হঠাৎ আসা বানের জলে ক্ষেতের ধান ভেসে গেছে, তারাও ধরনা দিয়েছিল। "ঠাকুর শোনেননি"— এত বড় কথা বলতে কেউ সাহস করে না। আরো দিনকাল পড়ে আছে। একবারে সব শিশুর মৃত্যু বা সব গরু হারিয়ে যাওয়া শেষ হবে না। কাজেই এই হতভাগ্যরা নিজের ফাটা কপালের দোষ দেয়। দাদিবুড়ার উপর অভিমান করে করে তাঁর উপরে নিজের বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে নেয়। ভবিষ্যতের সুবিধার কথা

ভেবে, আরো ঘুষ দিয়ে, অধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করে। কারণ এরা মানুষ। আগামী কালটা গতকাল হয়ে গেলেও মানুষ আগামী কালের জন্যে, আগামী পরকালের জন্যে কোমর বেঁধে পরিশ্রম করে। আর দাদিবুড়া, ঠাকুর— সব উপাচারকে একত্র করে গাঁঠরি বাঁধা— তাঁর ধর্ম— তাঁর সব নগদ।

হুঁকাবুড়া আকারে বাড়তে থাকে। মাথাব্যথার জন্যে, জ্বরের জন্যে, সন্তান লাভের জন্যে, তার থেকে মাটি নিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

১২

সারিয়াদান সেদিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছিল। সারারাত ধরে শুধু স্বপ্নের উপরে স্বপ্ন। সকালে উঠে ওর মনে হল ঠেঙ্গাজানিকে একবার দেখতে পেলে ভাল হত। নিজের থেকে দেখা হবেই হবে। হয়তো ও যখন নদীতে যাবে, আঘাটায় দাঁড়িয়ে ঠেঙ্গাজানি ওর দিকে চেয়ে থাকবে। তা সে দেখুক— এতে ওর কোনো আপত্তি নেই। কারণ এখন থেকে ও ঠেঙ্গার এবং ঠেঙ্গা ওর। ওকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— ও ঠেঙ্গাকে চায় কি না? এটা কেমন যেন হাসির কথা। এটা আবার লোকে জিগ্যেস করে নাকি? ছিঃ ছিঃ।

না, জল আনতে যাবার সময় ওর ঠেঙ্গার সঙ্গে দেখা হল না। দেখা হবে কি করে? কালকের এতবড় ঘটনাটা— ভোলা যায়? ঠেঙ্গা পুরুষ মানুষ মনের আনন্দে মদ খাবার ওর অধিকার আছে। কালকের এত বড় ঘটনাটা— পেট ভরে মদ খেয়েছে তো কি আর হয়েছে?— বেশি মদ খেলে দেরীতেই তো ঘুম ভাঙবে?

হ্যাঁ; সত্যি তো, ঠিক একলাঠি বেলা যখন হল, একবার পাড়া কাঁপিয়ে ডেকে ডেকে ঠেঙ্গার মা এই পথ দিয়ে গিয়েছিল। আবার কিছুক্ষণ বাদে ওর বাবা রাম নায়কও গেল— "আরে ঠেঙ্গা ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গা এদিকে আছিস্ নাকি?"

সারিয়াদান এলোচুলে বসে মাথায় রেড়ির তেল মাখছিল। সত্যি, কি লজ্জার কথা, এই পথ দিয়ে শুধু ঠেঙ্গা আর ঠেঙ্গা। মনে মনে এরা কি ভেবেছে? তাদের ছেলেটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখে সারিয়াদান চুপ্‌চাপ্ বসে আছে। এই পথ দিয়ে যাবার সময় খালি ডাকের উপর ডাক— আরে ঠেঙ্গা— ঠেঙ্গারে। ওর খুব হাসি পেল। ঠেঙ্গাজানিকে কি কখনো লুকিয়ে রাখা যাবে? নন্দিগ্রাম হাটে, ডুমাগুডা হাটে, এত কথা কেন— বিশাল ডুমরিপুট হাটে ঠেঙ্গাজানি যেখানে থাক, ঠিক ধরা পড়ে যাবে। তাকে কে লুকোবে?

এই লুকোনর কথায় ওর রাতের স্বপ্ন মনে পড়ে গেল— আনন্দে শরীরটা অবশ

লাগল, মনের মধ্যে কে যেন আবার সেই রকম সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠেঙ্গাজানির উপর অকারণ রাগ হল। ওঃ দেখো, এত বেলা হয়ে গেছে এই পথে একবার শুকনো কাশি কেশে গলা খাঁকারি দিয়ে গেলে কি এমন হয়ে যেত? আচ্ছা লোক বাবা।

ভাত খেতে বসে শুনল দূর থেকে কেউ একজন কর্কশ গলায় ডাকছে— হ্যাঁ, ওই ডোমপাড়ার আলেইবিরিয়া তো— য়্যাঁ, সকাল থেকে সে নেই... না এমনিতে কোথাও যায় না তো... খাবার সময় হয়ে গেছে, কোথায় গেল কুমারী? তার মেয়ে সন্তোষকুমারী। কোথায় গেছে? গেছে তো ভারি বয়ে গেছে। সে খুব ঢংগী ছুকরি। খালি ধাংড়াদের পিছু নেয়। মুখের দিকে তাকিয়ে এমন বেহায়ার মতন হাসে, আর ধাংড়াদের দেখলে জেনে বুঝে নিজের শরীরের দিকে খেয়াল করে না। ডোমদের মেয়ে তো। ছিঃ।

কি জানি কেন ওর বুকের ভিতরটা একটু দমে গেল। ও অর্ধেকটা খাবার খেয়ে উঠে পড়ল। ঘরের ভিতরে বসে প্যাঁটরা থেকে কাপড়চোপড় বার করে গুছিয়ে রাখতে লাগল। তারপর তেতুঁল ও একটু জল দিয়ে ধীরে ধীরে ওর পিতলের গয়নাগুলি মাজতে বসল। নামেই শুধু কাজ, হাত নিজের থেকে থেমে যাচ্ছে। মনের ভিতরে সাতপাঁচ চিন্তা।

দুপুর বারোটা পেরিয়ে আরো একলাঠি বেলা হয়ে গেছে। প্রথমে ফিস্ ফিস্, ও পরে জোরগলায় কথা বলতে বলতে তরতর করে পাড়ার লোক দল বেঁধে একদিকে ছুটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই দিক থেকে কান্না শোনা গেল। কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছে তাই কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ পাড়ার ওই মাথায় তো ঠেঙ্গাজানির বাড়ি। গ্রামের অন্যপ্রান্তে ডোমপাড়া থেকে ওই একই রকমের কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। বুকের ভিতরে টিপ্‌টিপ্ করছে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে সখী মারিয়াফুল বলল— "শুনেছিস্ লা, তোর বর ঠেঙ্গাজানি ওই পাড়ার ডোমেদের মেয়ে সন্তোষকুমারীকে উদুলিয়া নিয়ে কোথায় পালিয়েছে— তাই ওদের বাড়িতে সকলে কাঁদছে— আমি দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি নাকি?" "হ্যাঁ"—

সারিয়াদানের মুখ কালো হয়ে গেল।

ঘরের দরজাটি আধবোজা করে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

অর্ধেক তৈরী ঘরখানি। সামনে একটা মোটা কাঠের গুঁড়ির উপর সেই ঘরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কুঁড়েদের মতন রাম নায়ক রোজ বসে থাকে। ঘরটি অর্ধেক তৈরী হয়েছে। শুধু দেয়াল গাঁথা হয়েছে তাও পুরোটা নয়। ঘরের সামনে এ জায়গায় ঢিপি করে রাখা আছে কাদা আর মাটি ও কিছু ফালি করে কাটা বাঁশ। অল্পদূরে ছোট পাহাড়ের মতন বাঁশের জালি দিয়ে সেরা ফিরিঘাস গাদামেরে রাখা আছে। তার মনের খুশি মতো সে ঘরখানি তৈরি করছিল। একদিন এই ঘর তৈরি সম্পূর্ণ হত.

গৃহ প্রবেশের উৎসব হত, দেয়াল আর মেঝেতে কালো, সাদা ও রঙীন মাটি দিয়ে ডোরা কেটে লেপা হত। ঘরটি সম্পূর্ণ হত, সেই ঘরের চালা ছেয়ে যেত লাউ ও কুমড়ো লতায় আর দেয়াল বেয়ে উঠত সিম ও করলার লতা।

ঠেঙ্গাজানি ও সারিয়াদানের ঘর— ঘরের মেঝেতে সুঁয়া পিষবার গর্তে সারিয়াদান জোয়ার, সুঁয়া সবকিছু পিষত। এই ঘরের চালে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধত, ফড় ফড় করে উড়ে বেড়াত। দরজায় কুমোরে পোকা বাসা বানাত— তাতে তার বাচ্চারা বড় হত। উঠোনে কাক ও কুকুরেরা থাকত।

আর ঘরের এদিকে ওদিকে দু'তিনটি অবোধ শিশু খেলে বেড়াত। তাদের ফুরফুরে চুল, ধুলোমাখা গা, মুখে লালা ও নাকে সিক্‌নি ঝরে। তারা এই ঘরে বড় হত। কত দুষ্টুমিই না করত। কে বাবার গলায় কণ্ঠি টানে তো কেউ মার শাড়ির আঁচল ছেঁড়ে। এই পাহাড়ী দেশের শিশুরা যেমন নোংরা তেমনি অপরিষ্কার, কিন্তু ওদের চোখদুটি চঞ্চল ও কান সদা সতর্ক।

সারাদিন রাম নায়ক হাঁ করে সেই ঘরখানির সামনে বসে তাকিয়ে থাকে। ওর ছায়া ক্রমশ ছোট হতে হতে শেষে মিলিয়ে যায়। ওর মুখের হাঁটা কিন্তু বন্ধ হয় না। মাঝে মাঝে ঠেঙ্গার মা পাগলীদের মতন ধুলোমাখা গায় এলোচুলে দুহাতে বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার গাল নিজের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। তখন রাম নায়কের স্বপ্ন ভেঙে যায়। বাচ্চাদের মতন কিছুক্ষণ কেঁদে কেঁদে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আবার বসে থাকে। পিঠের ঝাঁকানিতে কাঠের গুঁড়িটা নড়ে ওঠে। দলা পাকিয়ে সে যেন একটা ছুঁচোল পাথর হয়ে গেছে। গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না— শুধু আঁউ, আঁউ, আঁউ। মনে হয় যেন কোনো বুনো জন্তু গুলির চোটে ঘা পচে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

এর ভিতরে সাতদিন কেটে গেছে। প্রতিদিন ওর একভাবে কেটেছে। গ্রামের লোকেরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, সে ওদিকে ফিরে তাকায় না, বাচ্চারা ওকে দেখে ভয় পেয়ে পালায়। ধনী রায়েতরা, নাপিত চাঞ্চেরী ডোম কাছে এসে সহানুভূতি দেখায়। ওকে বুঝিয়ে বলে— নায়ক, নায়ক, কপালে যা লেখা ছিল, তাই হল, আর বসে বসে ভাবছিস্ কেন? কতদিন এইভাবে উপোস করে খিদেতে পড়ে থাকবি? আহা— ওঠ্ ওঠ্ খাওয়া দাওয়া কর, কাজকর্ম শুরু কর, যেমন তেমন একটি ছোট ভোজের ব্যবস্থা করে জাতিতে উঠে পড়। ওঠ, ভাই ওঠ। রাম নায়ক কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মাথা তুলে টানা টানা ঘোলাটে চোখে, অতি বিকল হয়ে এমন ভাবে তাকায় যে তার মুখ দেখলে বুক ফেটে যাবে। হরিজানিও বন্ধু নায়কের কষ্ট দেখে কাছে আসে। নায়কের কাঁধে হাত রেখে খুব নরম গলায় ডাকে। "নায়ক ভাই, নায়ক ভাই"। রাম নায়ক তখন আরো মুখ নিচু করে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে। থুতু ফেলে ফেলে চারিদিকের মাটি ভিজিয়ে ফেলেছে। বেশি বিরক্ত করলে কেঁদে কেঁদে বলে—

"নেই, নেই, নেই।"

খবর পাওয়া গেছে ঠেঙ্গাজানি ও সন্তোষকুমারী কোরাপুট থেকে আসাম ডিপো মারফত আসামে চলে গেছে। পিলিমন্ ডোম দশমন্তপুর গ্রামের থেকে ছাল নিয়ে ব্যবসা সুত্রে কোরাপুটে গিয়েছিল। এই পথে ফিরবার সময়ে সেও বলছিল। যারা খুঁজতে গেছিল তারাও ফিরে এসে একই কথা বলছিল। ওরা দুজনে আসামে চলে গেছে। পাহাড়ী দেশের কি জানি কত লোক যেমন যায়, কেউ যায় পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচতে, কেউ যায় শুধু টাকা রোজগার করতে। কেউ কেউ ওই দেশে বাড়িঘর করে পাকাপাকিভাবে থেকে যায়। অনেকে মারা যায়। কেউ কেউ আবার ফিরে আসে।

রাম নায়ক অবুঝ হয়ে পাগলের মতন শোক করতে লাগল। গ্রামের সকলে অবাক হল। এটা ঠিক কথা— ওর ছেলে চলে গেছে। ওর পরে ওর ঘরে আর কেউ নায়ক পদে নিযুক্ত হতে থাকল না। ওর সকল আশা ভরসা ধূলিসাৎ হল। ওর জাতও গেছে। তবুও নায়ক যদি এইভাবে বোবা হয়ে বসে থাকে গ্রামের ভালমন্দ কে বুঝবে? খাজনা কে আদায় করবে? হিসেব নিকেশই বা কে করবে? অধিকারীরা এলে, তাদের চর্চা কে করবে? লোকে মুরুব্বি ছাড়া হবে। এই গ্রাম বিনষ্ট হবে।

দিনের পর দিন এইভাবে কাটছে দেখে গ্রামের লোকেরা ঠিক করল, এর একটা বিহিত করা দরকার। রাম নায়কের বাড়ি উপরে নিশ্চয় কোন প্রেতাত্মার দৃষ্টি পড়েছে। কোন অজান ডুমা, কে জানে? গ্রামের মঙ্গলের কথা ভেবে নায়ককে ওর দৃষ্টি থেকে মুক্ত করতে হবে। এই দুঃখদায়ক ডুমাকে তাড়াতে হবে। প্রতিকার করা নিতান্ত প্রয়োজন। এলিয়ো প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কিন্তু সে হিন্দু নায়ককে খুব ভালবাসে। এছাড়া অলেইবিরিয়ার মেয়েকে নিয়ে ঠেঙ্গার পালানোর ব্যাপারে গুরু, পাষ্টর বা প্রাচীন কেউই সে রকম অসন্তুষ্ট হয় নি। ওরা বিশ্বাস করে আজ না হোক ঠেঙ্গাজানি ও সন্তোষকুমারী গ্রামে ফিরে আসবে। তখন সাহেবকে বলে ঠেঙ্গাজানিকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়েও ওদের সম্প্রদায়ভুক্ত করা যাবে। ঠেঙ্গার বাবা গ্রামের নায়ক ছিল, এই সুবাদে বাবার পরে ঠেঙ্গা নায়ক হবে। তখন গ্রামে একজন খ্রীষ্টান নায়ক থাকবে। রবিবার দিন নায়কের নামে পরমপিতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে 'হালেলুয়া' গেয়েছিল। যিনি সকলকে উদ্ধার করবার জন্যে জগতের সব পাপ, সব দুঃখ নিজের উপর টেনে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে ওরা অনুরোধ জানিয়েছিল, "নায়কের আত্মার উপর থেকে দুঃখের বোঝা উঠিয়ে নাও, ওর আত্মা নির্মল হোক, এবং সন্তোষকুমারী যেন সুখে থাকে।" সকলে সমস্বরে "আমেন" বলে আবার 'হালেলুয়া' গেয়ে প্রার্থনা সভা শেষ করেছিল।

একজন প্রকৃত পড়শীর কর্তব্য করতে পেরেছেন ভেবে এলিয়ো প্রাচীন মনে শান্তি পেলেন। উপযুক্ত বন্ধুর কাজ তিনি করেছেন কিন্তু নায়কের প্রাণে শান্তি এল

না। নায়কের বৌকে বোঝানো গেল না। গ্রামের লোকেরা তখন দিশারির শরণাপন্ন হলে দিশারি পাঁজি ওল্টান। প্রথমে একটি ও পরে অন্য নাকের ফুটো টিপে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মদ খেল, মাথা চুলকাতে লাগল। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাটিতে দাগ কেটে, বিড়বিড় করে কি সব বলল। শেষে নিষ্পত্তি হল— দাদিবুড়ার কাছে বিশেষ পূজার আয়োজন করতে হবে। গুরুমাঈ নাচবে। ধাংড়ীরা নাচবে। সেই উৎসবে নায়ক ও তার বৌ যোগ দেবে— তবে দাদিবুড়ার দয়ায় ওদের প্রাণ শীতল হবে। যে দুষ্টু ডুমা তাদের ঘরে ঢুকে, তাদের সারাক্ষণ কাঁদিয়ে চলেছে, সে পালাতে বাধ্য হবে। পূর্ণিমা রাতে বিশেষ পূজার জন্যে গ্রামের সকলে প্রস্তুত হতে লাগল।

১৩

এই বিশাল পৃথিবী দিনের আলো ও রাতের আঁধারে যেন সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে। কখনো আঁধার রাতে সে যেন খুব ছোট্ট হয়ে গিয়ে কালো কম্বল ঢাকা দিয়ে কোন কোনায় ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু মনের গভীরের স্মৃতির মতন আধো জ্যোৎস্নায় ধৈর্যকে একটু একটু দেখতে পাওয়া যায়। কে কখন মুঠো মুঠো খইয়ের মতন তারাদের নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। কোনটি আকাশের গায়ে আটকে আছে, কোনটি বা খসে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে। তারই মধ্যে কিছু মানুষ আশা-নিরাশায় জোনাকির মতন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। তাদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের থেকে আলাদা করে চেনা যায় না।

রাম নায়ক নিজের মনের ভাবকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভাষায় প্রকাশ করতে শেখেনি। কেই বা শিখেছে? সে শুধু বোবার মতন এক জায়গায় বসে আছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই, কোথায় ঘুরছে নিজেই জানে না। তার জীবনে যা ঘটে গেছে, তাতে তার বেঁচে থাকার কথা নয়। ওর দুঃখ কাব্যেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ওর জীবন শুধু কতগুলি অনুভূতির সমষ্টিমাত্র, যা ওর সর্বাঙ্গে ধুলোর মতন জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি ধূলিকণাকে আলাদাভাবে তুলে নিরীক্ষণ করা যায় না। মানুষে সারা শরীর জুড়ে প্রাণ রয়েছে, কোনো বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই। ওর বুকের ভিতরটা কেমন জানি হু হু করে। ওর মনের বাঁশি যেন মহাশূন্যে নিঃশব্দ বাতাস। মাঝে মাঝে কি যেন সব চিক্ চিক্ করে দেখা যায়। তার পরমুহূর্তে দফায় দফায় অন্ধকার আসে, সবকিছুকে উল্টে পাল্টে কোনদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। বসন্তকাল এসে গেছে। হঠাৎ বেশ কিছুদিন যেন সবার ঘুমিয়ে কেটেছে। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। এই রকম ভাবনা বুঝি পৃথিবীর সকলে ভাবতে শুরু করেছে। চারিদিকে মহাকলরব শুরু হয়ে

গেছে। কত নাম না জানা পাখিদের কিচির মিচির। নানা রঙের গুঁড়োর মতন, কুসুমগাছের আঠার মতন তারা বনের লাতায়, ডালে ভরে আছে। গাছে গাছে ফুলের রোশনাই। আম বাগানে প্রতিটি গাছ মুকুলের ভারে অবনত। সেখানে মধুর লোভে এসে জুটেছে হাজার হাজার মৌমাছি আর ভ্রমর। গাছের ডালে, কোটরে ও পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে তাকাও অসংখ্য মৌচাক মধুতে ভরা।

বসন্ত এসেছে। আর দুমাস পরে চৈতি পরবের মহোৎসব বিভোরা পৃথিবী দুঃখী, তাপী, দীন দরিদ্রদের জন্যে কি বার্তা এনেছে? পায়ে দলা ঘাস রোদের ক্রমবর্ধমান তাপে পুড়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে। অগুনতি ফুল ঝরে পড়ছে। তাদের জন্ম মৃত্যুর খবর কেউ রাখে না। গাছে কটি মাত্র আমের মুকুল সতেজ থেকে গেছে। আর তাদেরই পায়ের তলায় গাদা গাদা ঝরা ফুল। আমের মুকুলের মৃতদেহের সঙ্গী শুধু মাছি আর পোকা। মৌমাছি বা প্রজাপতিরা ভুলেও ওদের খোঁজ নিতে আসে না। এই মাটির ফাঁক থেকে উঠে কত প্রজাপতি আর ফড়িং সুবাস নিতে ডানা মেলে উপরের মায়ালোকে উড়ে যায়। তারা তো কখনো নিচে নেমে আসে না। আধপোড়া ঘাস রোদের তাপে আরো তেতে পুড়ে ঝরা ফুলের বোঝা বুকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে উপরের দিকে চেয়ে থাকে, যেখানে ছোট ছোট পাখিরা উড়ে বেড়ায়, তাদের কারুর ডানার রঙ আগুনের ফুল্‌কির মতন, কারুর বা একফালি শরতের আকাশের মতন গাঢ় নীল। এই অনুভূতির ভিতরে রামা নায়ক স্তব্ধ হয়ে, জড় হয়ে বসে আছে। বসন্তের আহ্বান তাকে শুধু দগ্ধাচ্ছে। সে যেন আধপোড়া ঘাস।

প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে পথ হারিয়ে জঙ্গলী ঝরনার মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে সব কিছুই ওর অজানা অচেনা। এখান থেকে ওর নিস্তার নেই— তাই বসে বসে শুধু দিন গুণে চলেছে।

"নায়ক ভাই, ও নায়ক ভাই" হরিজানি কাঁধে হাত রেখে ডাকে।

"নায়ক, ও নায়ক" গ্রামের লোকেরা এসে ডাকে। কি সব বলে তারা? কি চায় এরা? এরা কারা? কেন ওকে বিরক্ত করতে আসে? ওঃ কি ঝামেলা! "খাবার খেয়েছিস্? ওখানে কেন বসে আছিস্। সারাদিনের রোদ তোর ওপর দিয়ে চলে গেছে। যা, বাবা, বাড়ির ভিতরে যা।"

"এরা কারা? কেন গোলমাল করছেরে বাবা?" তার মাথার চুলগুলি পেঁচানো তারের মনে হয়। দাঁত খিঁচিয়ে, ঠোঁট কামড়ে, বড় বড় চোখ মেলে, কখনো বা গুমরে গুমরে কেঁদে রাম নায়ক সেই আধতৈরী ঘরখানির দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, তার একটি ছেলে ছিল। কবে ছিল কে জানে? একটু একটু মনে পড়ছে যেন, না, না, পরিষ্কার মনে পড়ছে "বাবা, বাবা" বলে ডাকত। কবে, কি জানি তার একটি ছেলে ছিল— ওর জন্যে কতবার সে দাদিবুড়ার কাছে মানত করেছে। ছেলেটি শালগাছের মতন বেড়ে উঠছিল। খুব ভাল ছেলে ছিল। তারপরে—

আর নেই। শেষ হয়ে গেছে।

রাম নায়ক ড্যাব ড্যব চোখে সেই আধতৈরী ঘরখানির পানে তাকিয়ে থাকে। সে চলে গেল, গেল কি? মারা যায়নি তো? চলে যাওয়া আর মারা যাওয়া তার কাছে দুই সমান। ওই ঘরে কোথায় যেন ওর শবদেহ লুকিয়ে রাখা আছে। তার ছেলে— তার রক্তমাংস দিয়ে তৈরী এই ছেলে— তার মনের মন, কথার কথা এই ছেলে। তার অতি আপন। হায়, হায়, হায়, হায়।

রাম নায়কের মোষের মতন বড় বড় লাল চোখ আরো বড় দেখায়। মনের কোন নিভৃত কোণ থেকে, শরীরের কোন অভ্যন্তর থেকে জল বেরিয়ে ধীরে ধীরে ওর চোখ দুটিতে ভরে যায়। তারপর ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ে। মুখের হাঁটা আরো বড় হয়ে যায়। তার ভিতরে মাকড়সার জালের মতো সুতো দেখায়। ঝরা মুকুলের মতন উষ্ণ চোখের জল নিজে নিজেই ঝরে পড়ে।

পিছন দিকে ঘরে এক কোনায় ঠেঙ্গার মা আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ওর ছেলে কোথায় গেল? ওর খিদে পাচ্ছে না? মার কাছে চেয়ে সে একটু ফেন খাবে না? ফুরফুরে মাথা দিয়ে মার মোটা পেটে গুঁতো মেরে, কোলে ঝুলে পড়ে খাজা খাবার জন্যে বায়না ধরবে না?— "মা, গো, মা, খাজা এনে দে মা।"

ক্লান্ত হয়ে ঠেঙ্গার মা একটানা করুণ সুরে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদেই চলে। কি সুন্দর তার গলার স্বর, মধুর রাগিণীর মতন শোনায়। যত প্রাকৃতিক সঙ্গীত সব একটানা সুরে নয় কি? ঠেঙ্গার মার কান্না বাতাস কেটে কেটে কতদূর অবধি ভেসে চলে যায় বিভোর বসন্তের ছন্দের সঙ্গে এই সুর কোথাও জোড়া লাগে না। বসন্তের ফুল, সুবাস, উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে ঠেঙ্গার মার করুণ কান্না মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

১৪

পূর্ণিমা এসেছে। এখন রাম নায়ক একটু একটু খাবার খাচ্ছে। জমির হালচাল না বুঝলেও খাবার খেতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, এইভাবে ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠেঙ্গার মার কান্না পুরোপুরি থামেনি ঠিকই কিন্তু সেও উঠে রান্নাবান্না শুরু করেছে। এখন আরো চড়া গলায় কাঁদে, খাওয়া দাওয়া করে গলার জোর বেড়েছে মনে হয়। ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। সবই দাদিবুড়ার দয়া।

দিশারি যে বিধান দিয়েছে, তার তিলমাত্র নড়চড় হবার উপায় নেই। দাদিবুড়ার কাছে মানত করা হয়েছিল। ডোমেদের মেয়েকে নিয়ে, পরজা ছেলে এভাবে আসাম পালিয়ে যাওয়া খুবই অমঙ্গল। গ্রামের পরম্পরার বাইরে। আর এরজন্যে নায়কের শোক প্রকাশে সকলে ভেবেছিল সে বুঝি সত্যি পাগল হয়ে যাবে। এখনো অবধি

অবিশ্যি কি হবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ওদিকে দাদিবুঢ়ার কাছে পুজা দেওয়া সুনিশ্চিত। চৈত্র না হলেও আনন্দ ঢেলে দেবার জন্যে গ্রামের লোকেরা আজ চিরন্তন পূর্বপুরুষের অনাদি আত্মার, তার প্রকাশমান রূপের, যাকে তারা ন্যাড়া ঢিপির উপরে সাত খাঁজ কাটা ঠুঁটো খেজুর গাছের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে, তার পুজো করবে।

ঘরদোর লোপা-পোছা হল। পরজা সুন্দরীরা গ্রামের নিচে মারুন নদীতে ডুবে ডুবে স্নান করতে নামল। আগের মতন সারিয়াফুল ডাকল— "এ সারিয়াদান।" সারিয়াদান গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলল "উ"।

ঠেঙ্গাজানি চলে গেছে যাক্! আরো কত জানি তাকে কন্যামাঁগনি করতে আসবে। সে ঠেঙ্গাজানিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। কয় বছরের সব স্নেহ ঘৃণার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে চিরন্তন ধাংড়ী। ওর পায়ের তলায় এক টুক্‌রো চুম্বক আছে যার টান ধাংড়া চাওড়া বুকের উপর অনুভব করে। সারিয়াদান ও সারিয়াফুলের বন্ধুত্ব আবার আগের মতন হয়েছে। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে দুঃস্বপ্নের মতো ঠেঙ্গাজানির উদয় হয়েছিল। আবার তা মুরান নদীর ছল ছল জলের সঙ্গে ভেসে চলে গেছে।

রাতে একটা বড় গোল চাঁদ উঠল। পাহাড়ের চূড়ো ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। দাদিবুঢ়াকে গোল করে ঘিরে ধাংড়ীর দল হাতে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল। ধাংড়ারাও প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে গা ঘেষাঘষি করে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। প্রচুর রান্না করার মদ খাওয়া হল। দিশারি মন্ত্র পড়ল। গুরুমাঈর নাচ শুরু হল, ওর উপরে দেবী ভর করে বললেন— "ঠেঙ্গাজানি খারাপ ডুমা ছিল। সন্তোষকুমারী খারাপ ডুমা ছিল। ওদের জনমের আগের থেকে ওরা দুজনে এভাবে পালিয়ে যাবে এ কথা লেখা ছিল। তোমাদের সকলের জন্মের আগে থেকে আমি দাদিবুঢ়া, আমি সব জানি। তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করেছি। তোমাদের সকলের ভালমন্দ আমার হাতে, বাছারা, তোমরা কেউ ওদের জন্যে মনে দুঃখ করো না। নাচো, গাও, মদ খাও, আমাকে মদ দাও, মুরগী দাও। আমি অভয় দিচ্ছি, তোমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না।"

আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। মদ খাওয়া হল। গুরুমাঈ থামল। প্রচুর হট্টোগোলের মধ্যে নাচ শুরু হল। এলিয়ো প্রাচীন, গুরু সলমন্ এ সবে বিশ্বাস করে না। তারা দুজনে একধারে বসে চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল— "এইভাবে এরা শয়তানের পুজো করে। এদের শুধু অধোগতি হবে। এরা সকলে নরকে যাবে। কখনো কোনো দেবদূতের মুখের দিকে তাকাবে না। তারা এতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু রান্না করা মদে অবিশ্বাস নেই। প্রচুর মদ্যপান করে ওরা দুজনে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এলিয়ো প্রাচীন দাদিবুঢ়ার সামনে ডিগবাজী খেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। নিজের সাধনা ভঙ্গ করলেন। গোল হয়ে ঘিরে নাচতে থাকা ধাংড়ীদল হেসে হেসে প্রচুর

উৎসাহ দিতে লাগল। মাতাল সলমন্ গুরু ধাংড়ীদের দলের মধ্যে ঢুকে হাত তালি দিয়ে মাথা দুলিয়ে নাচতে শুরু করে দিলেন।

দাদিবুঢ়ার সামনে বড় করে আগুন জ্বালান হয়েছিল। পায়রা ও মুরগী বলি দেওয়া হয়েছিল, প্রচুর ফুল রাখা ছিল। আগুনের লাল আভায় অনেক দূর থেকে দাদিবুঢ়াকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

ডুংডুঙ্গার টুং টাং শব্দ, ডোম বাজনার গম্ভীর আওয়াজ ও অহরহ ঝঙ্কার, ধাংড়া ধাংড়ীদের চিৎকার ও হর্ষধ্বনি। সব মিলেমিশে কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

গ্রামের নায়ক ও তার স্ত্রীকে সেখানে আনা হয়েছিল। তারা একপাশে চুপচাপ বসেছিল। নাচ ও বাজনা চলাকালীন কোথা থেকে একটু মিঠি বাতাস এসে রাম নায়কের গায়ে তার ছোঁয়া রেখে গেল। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এল আরে, সত্যি তো।

বেপথে জঞ্জাল মাড়িয়ে এগিয়ে যাবার সময় কোথায় কোন শুকনো পাতার নিচের খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে মন যেন নিজে নিজে বলতে লাগল— আরে সত্যি তো! মনে পড়ল এমন একটা সময় ছিল, যখন সে নিজে ধাংড়া ছিল। এই রকম কত নাচের মজলিসে সে নেচেছে ও কত ডুংডুঙ্গ বাজিয়েছে। যৌবনের সেই দিনগুলিতে লুকিয়ে লুকিয়ে, কত ছলচাতুরী করে সে তার ধাংড়ীকে— সেই ঠেঙ্গার মাকে, জয় করে নিতে পেরেছে। আর আজকের এই দুর্দিনে— ঠেঙ্গার মা আছে। কতজন চলে গেছে, আবার কতজন চলে যাবে, কিন্তু সে আছে, আজকের এই জ্যোৎস্না ভরা রাত আছে, পিতৃ-পুরুষের প্রতীক দাদিবুঢ়াও আছে। ঠেঙ্গাজানির মতন ধাংড়া— সেও ডুংডুঙ্গা বাজাত, ধাংড়ী নাচাত, আজকে তার ইচ্ছা হল, সে তার মনের মতন ধাংড়ীকে বেছে নিয়ে কোনো নতুন জায়গায় কাজকর্ম করতে চলে গেছে— সে পুরুষ মানুষ, তার মনের খুশিতে সে চলে গেল, এটা তার কপাল।

গোষ্ঠীর সেই ধুলো ওড়ানো আনন্দ নৃত্যের দিকে মুখ করে রাম নায়কের মন নিজে নিজে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। নাচের নেশা ওর মনকে রাঙিয়ে দিল। অনেকদিন জ্বরে ভুগে, সেরে উঠে, শুকনো মুখে, দিনের উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে প্রস্তুত হবার মতন সেও প্রস্তুত হতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে "দাদিবুঢ়ার" তুষ্টিবিধান শেষ করে গ্রামের লোকে দল বেঁধে গ্রামের রাস্তায় নেমে এল। পরজাদের নাচ একবার শুরু হলে শেষ হতে আর চায় না। সারারাত ধরে চলে। তারা আজ প্রাণভরে নাচবে।

চাঁদের আলোয় ধোওয়া ঢিপির উপর থেকে উঠে আসতে রাম নায়কের কিছুতেই মন চাইল না। আজ ওর মনের অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যেন আলোর স্রোত উঁকি মারছে। আজ সে ভাবতে পারছে। রাগ করতে পারছে। প্রথমে নিজের উপরে, তারপরে ছেলে ঠেঙ্গাজানির উপরে এবং সবশেষে মায়াবিনী

সন্তোষকুমারীর উপরে। সে অন্যান্য ডোম মেয়েদের মতন জাদু জানে, ও বশীকরণ করতে পারে। তারপর প্রশান্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে মিলিয়ে দিয়ে সেও সকলকে ক্ষমা করে বলতে লাগল সব ভাগ্য, কপালে যা লেখা আছে, তাকে খণ্ডাবে কে?

সকলে চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দাদিবুঢ়ার কাছে সব চুপচাপ হয়ে গেল। নিচে গ্রামের রাস্তা থেকে নাচ ও বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটি গ্রামের একটি গোষ্ঠীর আনন্দধ্বনি পর্বত থেকে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে পাহাড়ী দেশের আরো কত ছোট ছোট গ্রামের গোষ্ঠীর কানে ভেসে ভেসে পৌঁছে গেল। এইভাবে কিছু সময় কেটে গেল, ধীরে ধীরে সব কিছু যেন একটু থিতিয়ে এল। রাম নায়ক চারিধারে তাকিয়ে ধারে কাছে কেউ নেই দেখে চোরের মতন চুপি চুপি দাদিবুঢ়ার কাছে ফিরে এল।

মনের সব চিন্তাভাবনাকে কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে রেখে দেবতার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সে দাঁড়াল। এটা তার মুহূর্ত, যখন সে আর তার দেবতা মুখোমুখি— মাঝখানে কোন আল নেই, বেড়া নেই— শুধু ভক্ত আর ভগবান। কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছে। দাদিবুঢ়ার পায়ের তলায় মাটিতে বসে, শুয়ে পড়ে, কান্নায় ভেঙে পড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল— "দাদিবুঢ়া; তোর মনে এই ছিল?— তোর কাছে কি দোষ করেছিলাম যে তুই আমার এমন সর্বনাশ করলি? তুই বলছিস্ আমার ঠেঙ্গা খারাপ ডুমা, তবে তুই কেন ভাল ডুমা আমার ঘরে পাঠালি না দাদিবুঢ়া? পেলে পুষে বড় করলাম— এইটুকুন থেকে এত বড়টি করলাম। শেষে তুই কিনা আমার ছেলেকে দিয়ে আমার মুখে লাথি মারিয়ে দূরদেশে তাকে পাঠিয়ে দিলি? দাদিবুঢ়া; তুই কেন আমার বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিলি?"

এই বলে হাউহাউ করে কেঁদে রাম নায়ক দাদিবুঢ়ার পায়ে পড়ল। সাত খাঁজকাটা খেজুর গাছের খুঁটি পায়রা মুরগীর রক্তে রাঙ্গা হয়ে রান্নাকরা মদে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে। তার নড়চড় কিছু নেই।

তার বুড়ি, ঠেঙ্গার মা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছাল, তখন নায়কের খেয়াল হল। বুড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে উঠিয়ে দাঁড় করাল। বুড়োবুড়ি দু'জনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কেঁদে দাদিবুঢ়াকে পিছনে রেখে গ্রামের রাস্তা ধরল। বুড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কপালে যা লেখা ছিল— তাই হল। তুই এমন পাগলামি করলে আমি কাকে নিয়ে ঘর করব? আয় আমরা বাড়ি যাই।"

১৫

পাহাড়ী দেশকে মাতিয়ে, নাচিয়ে, মহাসমারোহে চৈত্রমাস এল, আবার চলেও গেল। আখের দিন শেষ হল। শশা ও ঝিঙের দিন এসে সেও চলে গেল। এরপর এল জ্যৈষ্ঠ মাস। বাড়িতে কারুর বসে থাকার সময় নেই। যেখানে দেখ— চাষের কাজ চলেছে। ধূসর আকাশে এক এক টুক্‌রো ছাইরঙ্গা মেঘ দেখা গেল— জমতে জমতে তাদের রং ক্রমে কালো হল। তারপরে বজ্রে বসুধা কাঁপিয়ে প্রথম এক পশলা বৃষ্টি ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে উজাড় হয়ে পড়ল। রাম নায়ক এখন গ্রামের হালচাল সব বোঝে। ক্ষেতে খামারে কাজ করে। সে কাজের মানুষ, চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। নায়ক ও তার স্ত্রী আবার আগের মতন সাধারণ মানুষ হয়েছে। কবে তারা অন্য রকমের হয়েছিল— কারুর মনে নেই। কবে ঠেঙ্গাজানি চলে গেছে, কবে সন্তোষকুমারী চলে গেছে, সে কথা চাষের জমির থকথকে কাদায় কোথাও লেখা নেই। শুধু উপরে ধর্ম আর নিচে বসুমতী। মাঝখানে কোন কিছু নূতন নয় পুরাতনও নয়।

পরজা লোকেরা বলল— দেখ; দাদিবুঢ়া কেমন ঠাকুর! ডাকলে সাড়া দেন। রাম নায়কের যা অবস্থা হয়েছিল, কে বিশ্বাস করবে সে আবার ভাল মানুষের মতন সব কাজকর্ম করবে? তাকে কে ভাল করল? সেই দাদিবুঢ়াই তো। দাদিবুঢ়ার কৃপায় বিয়ের সাতবছর পরে সুন্দুরু পরজার একটি ছেলে হয়েছে। মিলকুজানির *পোঢ়কাইলা* ছিল, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। লুকুজানি বেআইনী মদ তৈরির অপরাধে জেলে গেছিল, সে এখন বাড়ি ফিরে এসেছে। এইরকম কত তার মহিমা, যার বিশ্বাস আছে সেই একমাত্র বুঝতে পারবে। অন্যরা কি করে বুঝবে? এই ডোমরা দাদিবুঢ়াকে বিশ্বাস করে না। না করুক, ওদের কি ভালটাই বা হচ্ছে? পিতর, কিমন্ ফাউল ও মিকাল মুষলমুণ্ডা গ্রামের হারান গরুকে জঙ্গলে ঝরনার ধারে মেরে খেয়ে ফেলার অপরাধে জোড়ে জোড়ে বাঁধা হয়ে *মামার বাড়িতে* গেল। বেণিয়াঁ ও মসিক্ চোলাইমদ রাঁধছিল— তারাও ধরা পড়ে, জেলে গিয়ে, জরিমানা দিল। কেন আবার? দাদিবুঢ়া রেগে গেছে বলে।

অন্য গ্রামের লোকেরাও ছাতা মাথায় দূর গ্রামে যাবার সময় খাটি পথে ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে থাকা দাদিবুঢ়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করে। লোকে বলাবলি করে "ওই যে দাদিবুঢ়া"। এত জোর বৃষ্টি নামল, অন্ধকার ছেয়ে গেল—

পোঢ়কাইলা— মহিষ
মামার বাড়ি— জেল

এ সব তারই কেরামতি। অন্ধকার রাতে, ঝড়তুফানের প্রচণ্ড দাপটে যখন ঝোলার জলের গর্জন বাঘের গর্জনকেও ছাড়িয়ে যায় "দাদিবুঢ়া" নির্বিকার চিত্তে টিপির উপর দাঁড়িয়ে থেকে বজ্রবিদ্যুতে নিজের হুকুম জারি করে— অন্ধকারকে বলে "আরো ঘন হও।" মেঘেদের কাজ ভাগ করে দেয়। "তুই যা, মারিচিমাল পাহাড়ে গিয়ে জল ঢাল। তুই কন্ধ বেড়া পদরে, তুই লরেশঘাটি পেরিয়ে নারগাছে জল ঢাল।"

দাদিবুঢ়া টিপির অন্যদিকে নিচে শ্মশানে, রাত্রে মাঝে মাঝে যখন বৃষ্টি ঢালা বন্ধ থাকে এখানে সেখানে আগুন লাফিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত। লোকে বলে "দাদিবুঢ়া" পিকা ধরাচ্ছে। পরজা লোকের এইরকম ঠাণ্ডা অন্ধকার রাতে বাড়িতে ধুংগিয়া না জ্বালিয়ে রাখলে রাতভোর ওদের বাচ্চাদের পাহারা দেবে কেমন করে? শেয়ালের গর্তের মতন গরম ঘরের ভিতর থেকে মায়েরা বাচ্চাদের আঙুল তুলে "দাদিবুঢ়াকে" দেখিয়ে দেয়, চিনিয়ে দেয়। কোলের বাচ্চারা আধো আধো কথায় বলে "এ-ত দাদিবুঢ়া, এ— ত— দাদিবুঢ়া"।

সব তার লীলা, তাকে জিতবে কে?

বর্ষার শেষের দিকে দিশারিবুড়ো অসুখে পড়ল। জ্বর আর বুকে ব্যথা। সে গ্রামের পুরোহিত ও জ্যোতিষী এবং দাদিবুঢ়ার পূজারী ও পাণ্ডা। বুড়ো দিশারি একা মানুষ। ওকে দেখাশুনা করবার নির্দিষ্ট কেউ নেই। পাড়া প্রতিবেশীদের দয়ার উপর থাকে। সে লন্ধামদ খেতে থাকে এবং তার সঙ্গে নানা রকমের জড়িবুটিও খেতে থাকে। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘরের বাইরে এসে, জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকা "দাদিবুঢ়ার" দিকে তাকিয়ে বারম্বার প্রণাম করে। গ্রামের বাচ্চাদের হাতে হুঁকোবুঢ়ার গা থেকে কাদা মাটি আনিয়ে মুখে ও কপালে মাখে, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পাওয়া গেল না। দিন দিন রোগটা বেড়েই চলে। বৃষ্টিতে ভিজে ঘরের মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে হয়েছে। ফুলো চালা দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। তারই মধ্যে স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে কিছু ফিরিঘাসের উপর ছেঁড়া চট বিছিয়ে, ভাঙা জালার (বড় কলসীর) টুকরো গায়ে চাপা দিয়ে দিশারি বুড়ো শুয়ে আছে। সে সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। নিবিষ্ট মনে দাদিবুঢ়ার ধ্যান করে। বুকে ব্যথা বলে, এক হাত দিয়ে বাঁদিকের বুক চেপে রেখেছে।

দিশারি বুড়ো ধ্যান করতে থাকে। উঁচু টিপিটা, তার উপরে দাঁড়িয়ে "দাদিবুঢ়া"। সাত খাঁজকাটা ঠুঁটো খেজুর গাছের গুঁড়িতে দলাদলা সিন্দুর ঝক্‌ঝক্ করছে। দলাদলা কাজল, মাথায় পাগড়ি, মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি সদাসর্বদা লেগে আছে। সারা পৃথিবীর সুখ-দুঃখের চিন্তা ভাবনায় বুঝি তাঁর কপালে এত রেখা, সব মিলিয়ে কী সুন্দর রূপ। পাশে হুঁকোবুড়ো দাঁড়িয়ে। কী দয়ালু দাদিবুঢ়া, আর কী পরাক্রমী! আহাঃ দিশারি বুড়ো ধ্যান করতেই থাকে। এই সত্তর বছরের অভিজ্ঞতায় তার চোখ যেখানে যত সুন্দর রূপ দেখেছে, সব রূপের সব সৌন্দর্য একত্র করে সে ভাবতে থাকে— সেই

সুন্দরিমা সত্যি যেন দাদিবুঢ়ার ভিতরে ফুটে উঠেছে। ওর বিশ্বাস হয় সেই অপরূপ রূপ নিয়ে দাদিবুঢ়া ওর বিছানার পাশে এসে ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে আছে,— মিটি মিটি হেসে ওকে বলছেন— "তুই তো আমার পূজারী। তুই আমার অতি প্রিয়, তোকে সারিয়ে তুলব না তবে কাকে সারাব?" ক্রমশ রোগ বেড়ে গেল। দিশারি বুড়ো আর কথা বলতে পারে না। জ্বরের ঘোরে ভুল বকে। ওর গলার ভিতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। ও মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। ঘোরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে। বহু বছর আগে গত স্ত্রী মঙ্গলি ও ছেলে ঝালিয়ার নাম ধরে ডাকতে থাকে। গ্রামের সকলে ওকে দেখতে এসে মন্তব্য করে— দিশারি বুড়ো মরা লোকেদের ডুমা দেখতে পাচ্ছে ও আর বাঁচবে না। মাঝে সারাটা দিন ছেলে ও স্ত্রীকে ডেকে ডেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সেদিন রাতে নাপিত চাণ্ডেরী ডোম ওর কাছে পাহারায় ছিল, সকালে দেখা গেল দিশারি বুড়ো মরে কাঠ হয়ে আছে। মুখ বেঁকে গেছে, "হাঁ" করে দাঁত খিঁচিয়ে কাকে যেন ভেংচি কাটছে। চোখদুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। "দাদিবুঢ়ার" পাশ দিয়ে ওদিকে শ্মশানে দিশারি বুড়োকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেই দিনটি খুব রোদ ঝক্‌ঝকে ছিল। দাদিবুঢ়ার একনিষ্ঠ পূজারী, দিশারি বুড়ো চোখ উল্টে, তার সবচেয়ে প্রিয় দেবতাকে ভেংচি কাটতে কাটতে মাটির নিচে গেল।

ওর বাঁচবার খুব ইচ্ছা ছিল, সেই কারণে ঠাকুরকে সে অনেক ডেকেও ছিল।

মৃত্যু বড়ই বীভৎস ব্যাপার। এক মহূর্তে মানুষের সুন্দর শরীরকে কুৎসিত কদাকার করে দেয়। এইজন্যে লোকে মুখে ওর নাম নেয় না। সে মরলে আবার জন্মাবে এই বিশ্বাস নিয়ে পরজারা বাঁচে। জন্মানো শিশুকে বলে তুই আগের জন্মে অমুক সমুক মানুষ ছিলি। আবার জন্ম হয়ে সুখ দুঃখের কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে শেষদিন পর্যন্ত আনন্দে মেতে থাকে। তারপরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউ মৃত্যুর নাম মুখে আনে না। সে কিন্তু তার সময় বুঝে নানা অছিলায় আসে, যেমন জ্বর, বুকব্যথা, বাঘে খাওয়া ইত্যাদি। এগুলি অতি সাধারণ কারণ আরো কত যে আছে। দিশারি বুড়ো যাবার পরে পরে আরো দশবারজন গেল। প্রতি গ্রামে জ্বর ও বুকব্যথা। "দাদিবুঢ়ার" কাছে অসংখ্য পুজো দেওয়া হল, তাই বোধ হয় দশবার জনের মৃত্যুর পরে জ্বর, বুকব্যথা সেরে গেল। না হলে কে জানে, সারা গ্রাম এই অসুখে উজাড় হয়ে যেত বলে লোকে বলছিল। এদিকে বর্ষা শেষ হয়েছে। শরৎ এসে গেছে। মাটিতে ভিজে ভাব নিঙড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টির জলে গ্রামের ধুলো ময়লা সব ধুয়ে গেছে। মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর হয়েছে। গ্রামে আরকিছু হল না। লোকে "দাদিবুঢ়ার" কাছে পুজো দিয়ে বলল্— "তো আসন যেন আর না টলে। তুই শান্ত থাক্ দাদিবুঢ়া, আর কষ্ট দিস্ না।"

১৬

রাম নায়ক নিজেকে কাজেকর্মে ডুবিয়ে দিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জোয়ান জনমজুরদের নিয়ে জমিতে ক্ষেতের পরিচর্যা, ফসল ফলানো ইত্যাদি নানা কাজে প্রচণ্ডভাবে খাটে। তার স্ত্রীও বাড়িতে বসে থাকে না, একটু জোয়ার সিদ্ধ করে দিতে যতটুক সময় লাগে, তারপরে সেও ক্ষেতে যায়। গোবর ছড়ানো, পচিয়ে সার তৈরি, আগাছা বাছাবাছি, ধান রোওয়া সবই সে করে।

ঠেঙ্গাজানির নাম তারা মুখে আনে না।

আধতৈরী ঘরখানি চক্ষুঃশূল হয়ে সর্বদা ওদের চোখের সামনে থাকে। যদিও ওটাকে দেখতে ওদের একটুও ভাল লাগে না, ভেঙে ফেলতেও হাত উঠে না। দেখতে দেখতে এটিও গা সওয়া হয়ে গেছে। বৃষ্টির চোটে দেয়ালগুলি ধসে পড়েছে— থেকে না থাকারই মতন।

সারাদিন মাটিকাদা, কাঁকর পাথরের সঙ্গে কারবার। গা ঘষাঘষি— ওরা খুবই বনেদী, ওদের ভালমন্দ নেই হাসিকান্নাও নেই। জলে বড় বড় কেঁচোরা ঘুরপাক খায়। গোবরের পোকা— তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ। মাটি মানুষ বলে বাড়তি খাতির করে না। মাটির মুখে মুখ লাগিয়ে ডাকতে মাটি মানুষকে সাহায্য করে না।

রাম নায়ক ভাববার অবসর পায় না। মাঝে মধ্যে মন যখন জীবন্ত সঙ্গীর সঙ্গ খোঁজে তখন রাম নায়ক লক্ষ করে সর্বত্র অফুরন্ত জীবনের ছড়াছড়ি। ক্ষেতে *পাচি* ঢেউ খেলছে, সবজির বাগান তরিতরকারীতে ভরপুর। পাহাড়ের মাথায় চষা ক্ষেতে রেড়িগাছের জঙ্গল, মাঝখানে অড়হর ক্ষেত, তার নিচে *সুঁয়া* ক্ষেত, আরো নিচে ঢেউ খেলান জমিতে জোয়ারের ক্ষেত, জমিতে ধান, আবার *ঝোলাক্ষেতে*ও প্রচুর ধান। এরা সকলে চাষীর বন্ধু, তার হাতে কেরামতি। তার কাব্য কবিতা। তার সন্তান। এদের নিয়ে কত সমস্যা। প্রতি বৎসর এর *ককারি বেড়া* থেকে *উরিয়া বেড়াতে* আসে। এই ফসলের জঙ্গলের মধ্যে কে কোথায় নিজের স্থান করে নেয়। এই বিপুল সৃষ্টির চারিদিকে দৃষ্টি মেলে ওর মনের ছোট ছোট অভিযোগ, দুঃখ গ্লানি, সব

পাঁচি — শস্য বিশেষ
সুঁয়া — এক প্রকারের ঘাসের বিচী, গরীব লেকে খায়
ঝোলাক্ষেত — পাহাড়ী ঝরনার বুকে বাঁধ দিয়ে ঝোলাক্ষেত করা হয়।
ককারি বেড়া — শৈশবাবস্থা
উরিয়া বেড়া — যৌবনাবস্থা

কোথায় মিলিয়ে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের সৃষ্টিতে সে চির সবুজ। পরমপিতা দাদিবুঢ়ার পুত্র চরমপিতা পরজা চাষী।

রাম নায়ক এক পাচির কি ব্যবস্থা হবে, ভাবে না। কোনো পরজাই ভাবে না। কবি কি কখনো ভাবে তার কবিতার ভবিষ্যৎ কি? কত জায়গায় মহাজনরা আগের থেকে দাদন দিয়ে রেখেছেন। পাচিকাটা হতে না হতে তাদের লোকেরা এসে মেপে নিয়ে চলে যাবে। কত জায়গায় কর্জা নেওয়া আছে। পাচি দিয়ে তা শোধ হবে। এছাড়া খাজনা, দস্তুরি, অধিকারী জরিমানা— এটা সেটা কত কথা। কিন্তু তার পাচির দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পাচি তার কবিতা। গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে অতএব গাইতে হবে।

ছেলের কথা মনে পড়লে ফোঁস্ ফোঁস্ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। মার চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। আর বাবার মনে আসে রাগ ও অশান্তি। নিজের কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে তারা কাজে ডুবে যায়। কাজ থেকে অন্য কাজের সৃষ্টি হয়। সময় পাওয়া যায় না। পচানো জোয়ারের লন্ধামদ আর লুকিয়ে তুরিয়ে করা মহুয়া মদ শরীরের সব বেদনা দূর করে দে। ওরা কিছু ভাবতে পারে না।

১৭

এই বৎসর এই গ্রামে খুব অমঙ্গল হচ্ছে। গরুদের গায়ে কি যেন গুটি বেরুচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তারা পাতলা পায়খানা করতে করতে মরে যাচ্ছে। বুরগীরাও চুনের জলের মতন পায়খানা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ে মারা যাচ্ছে। কোথা থেকে এল এই রোগ? যেখানে শোন এক কথা।

নতুন দিশারি রুফজানি পুরোন দিশারির থেকে কম জানে তা নয়— বরঞ্চ এ বেশী নিষ্ঠাবান, অধিক পরিশ্রমী ও অল্প পরিমাণে মদ খায়। সে যত উপায় বাতলাল কোনটাতে কোনো ফল হল না। এ অমঙ্গলকে ঠেকানো গেল না। 'দাদিবুঢ়া'র কাছে নেচে নেচে ধাংড়ীদের পায়ের তলার চামড়া উঠে গেল। আয়ুর জোরে অসুখে ভুগে যে দুচারটি মুরগী ও পায়র বেঁচেছিল, তাদের বলি দিয়ে ঠাকুর দেবতাকে তুষ্টির চেষ্টা করা হল। অনেক মদ ঢালা হল। এইভাবে অনেক কায়দা করা হল, কিন্তু সব বৃথা।

প্রথমদিকে খ্রীষ্টান পাড়ার বুদ্ধিমান ডোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় হিন্দুদের এই পূজা পদ্ধতিকে হেসে উড়িয়ে দিত কিন্তু এই রোগই যখন ওদের গরু মুরগীদের হল, ওরা মণ্ডলীর সভা ডাকল। পরমপিতা পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করে বারম্বার আর্জি পেশ করতে লাগল। গরু মুরগীদের জন্যে অশেষ বিনয়ের সঙ্গে মিনতি জানাল।

কিন্তু কোনো ফল হল না।

“দাদিবুড়ার পায়ে নিচের উপত্যকায় মরাগরুদের মাংস খাবার জন্যে কাক, শকুনি, শেয়াল, কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল। খালি অশুভ ডাক।

এক জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ের মাথায় উজ্জ্বল একফালি চাঁদ উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে কোথাও কোথাও খানিকটা ঝক্‌ঝকে আলো দেখা যাচ্ছে। গাইগরুদের গোয়ালে বাঁধবার বেলা গড়িয়ে গেছে। রাস্তার আগুনের ধারে বসে লোকেরা জটলা পাকাচ্ছে। “আমার চারটি গরু মরে গেল, এ বছর চাষের কাজ কিভাবে করব?” “আমার তো সবকটি মরে গেল।” গৃহিণীর, আগুনের মশাল হাতে গোয়াল ঘরে ঢুকে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দুঃখ পায়। খালি খুঁটিগুলি কোনটা পুরো খালি, কোনটাতে বা দড়ি ঝুলছে। কোন কোনায় দু’একটি গরু শুয়ে আছে— বাকি সবটা খালি।

এই গরু আর মুরগীরা— তারাও বাড়ির লোকের মতন হয়ে গেছে। মানুষের সংস্পর্শে এসে স্থান, কাল নিয়ে তাদেরও এক একটা ইতিহাস আছে। তারা মানুষের বন্ধু। কাঁকরমাটির দিগ্‌বিজয়ী বীর। আজ তারা একে একে চলে যাচ্ছে। করুণ চোখে বোবা দৃষ্টি মেলে কিছু বলবার আগে চিরদিনের জন্যে শেষ।

রূফাজানির চিকিৎসা খাটছে না। কিন্তু ওর আদর কিছুমাত্র কমেনি। দিশারি হবার আগে ও নানা প্রকার জড়িবুটি ও ওষুধের কারবার ভালভাবে জানত। এখন তার সঙ্গে মিশেছে ঠাকুরের আশীর্বাদ ও গোষ্ঠীর পৌরহিত্য। ক্ষেতের কাজ সেরে, বাড়ি ফিরে সে থলে কাঁধে গোয়ালে গোয়ালে ঘোরে।

কোথাও ধূপ জ্বালায়, কোথাও বা খালি মন্ত্র পড়ে, গরুর গালে থাপ্পড় মারে, কাউকে কাউকে আবার ওষুধ খেতে দেয়। ওর চিকিৎসায় গরু মারা যায় ঠিকই, কিন্তু ও না গেলে নয়।

লোকে বলে— “আজ যদি পুরোন দিশারি বেঁচে থাকত...।”

“রূফাজানি পরিশ্রম করে ঠিকই, কিন্তু ও কি কিছু জানে, না জানে না?”

“কিরে দিশারি, কেমন পুজো দিলি? কই কেউ বাঁচল না তো? আমার তিনটি মাথাই যে গেল।”

রূফজানির আশ্চর্য লাগে, ভাবে মানুষর বড় অকৃতজ্ঞ— হ্যাঁ, দুনিয়ার রীতিই এই রকম। কি আর করা যাবে? সে সকলকে খুশি করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে অজানা গাছ, লতা পাতা সংগ্রহ করে আনে। কত জন্তুর শুকনো মল, হাড়গোড় জোগাড় করে এনে, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে, লোকেদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওষুধ তৈরি করে। তবুও সে থেকে থেকে লোকেদের টিপ্পনী শোনে— “রূফাজানি পারবে না— নতুন লোক খুঁজব? একজন কন্ধ দিশারিকে ডাকলে হয়। গার্ড়া ঝোলাতে বিঙ্গু সাওঁ ও তার ভাই চিক্‌নু কন্ধ থাকে।” সকলে [illegible] নাপিত চাঞ্চেরী ডোম

সকলের কথায় মাথা নাড়ে। পরে সেই কথা আরো বাড়িয়ে বলে বেড়ায়। নায়ক শুধু মাথা নাড়ে। রূফজানি চুপচাপ্‌ তাকিয়ে থাকে।

একদিন সকালে রূফজানি গ্রামবাসী সকলকে এক জায়গায় জড়ো করল। তখন ওর চুল খোলা, চোখ দুটি টক্‌টকে লাল ও বসে গেছে। রূফজানি বলল— “কাল রাত্রে দাদিবুড়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল তাকে। সে বলল— গ্রামে ঘোর অনাচার হয়েছে। গ্রাম নায়কের ছেলে পরজা জাতের হয়ে, নিচুজাতের ডোম মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল। নায়ক জাতে উঠল না। ভোজ দিল না। সে একইরকম থেকে গেল। আমি “দাদিবুড়া”— সকলের উপর আমার অধিকার। আমাকে অমান্য করলে, আমি কি করে তা সহ্য করব, বল তো? এর প্রতিকার কর। না হলে সর্বনাশ ঘটবে, জেনে রাখ।” গ্রামের পাঁচ পঞ্চায়েত সেখানে বসে ছিল, ছোট বড় সকলে উপস্থিত ছিল। নায়ক ঘাড় গুঁজে বলল— “আমার সব শেষ হয়ে গেল। গরু গেল, ছেলে গেল। আমি তো কখনো দাদিবুড়াকে অমান্য করিনি। ও কেন এমন কথা বলল?” রূফাজানি এর উত্তরে বলল— “আমি স্বপ্ন দেখলাম, তাই বললাম, তাই বললাম, যা দেখলাম, বলতে আমাকে হুকুম করা হল— তাই বললাম। আমি কি মন থেকে বানিয়ে বলছি নাকি?” সকলে মাথা নেড়ে বলতে লাগল— “সত্যি কথা, সত্যি কথা।”

অতএব রাম নায়ক প্রায়শ্চিত্ত ভোজ দিল। ভাল রকম শীত পড়ে গেছে। হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। গ্রামের বার আনা গরু ও চোদ্দ আনা মুরগী মরে গেছে। সর্বনাশা মড়ক আপনা আপনি থেমে গেল।

রূফাজানি গর্বে বুক ফুলিয়ে চারিদিকে বলে বেড়াল— “দেখলে তো, আমি কি বলেছিলাম।” এতে তার মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। গার্ড়া ঝোলার চিক্‌নু কন্ধের নাম কেউ আর মুখে আনল না। তার পাট্টা চিরস্থায়ী হল।

চারিদিকে বৃষ্টি ধোওয়া চক্‌চকে গরুদের হাড়গাদার দিকে তাকিয়ে লোকেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কেউ কেউ বলল— “রূফাজানি, আর একটু আগে থাকতে বললি না।”

রূফাজানি বলল— “আরে, মেঘ, বাঘ, অধিকারী ও দেবতা— এদের মনের খবর কার জানা? হ্যাঁ, যখন ওদের যা মনে হয়। আমি আর কী করব?”

কিন্তু রূফাজানি ওর প্রভাব খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অমঙ্গল ঠেকাতে পারল না। গরু মড়ক শেষ হতে না হতে ও একটা দিন ধার্য করেছিল— একদিনে গ্রামের অনেক ধাংড়া-ধাংড়ীর বিয়ে হয়ে গেল। এরপরে নাকি একবছর বিয়ে বন্ধ। সারিয়াদান গেল, সারিয়াফুল গেল, বোতি, মোতি, রঙ্গিয়া, যাফি সকলের বিয়ে হয়ে গেল। ভোজ খেয়ে, নেশা করে, নেচে কুঁদে কদিন ভালই কাটল। কিন্তু ঠিক অঘ্রান মাসের শেষের দিকে কাছের জঙ্গল থেকে কাঠ্‌রেরা ফিরে এসে জানাল— বনের মধ্যে কয় জায়গায়

বড় বাঘের পায়ের ছাপ পড়েছে। এর পাঁচদিন পরে ঠিক সন্ধ্যার সময় সকলের চোখের সামনে ঝুম চাষের জন্যে তৈরী চন্দাপদরে জিরু পরজাকে বাঘে ধরল। লোকে ভয়ে কাঁপতে লাগল। রূফজানি পুজোর বিধান দিয়ে ওই বনে কীল পুঁতে দিল কেউ সেখানে যাবে না— কারণ লোকেদের বিশ্বাস জিরু পরজার প্রেতাত্মা বাঘডুমা হয়ে, বাঘকে অন্য লোকের কাছে নিয়ে যাবে। তিনদিন পরে দু ক্রোশ দূরে চেণ্ডীগুড়া গ্রামের কোমনা সাঁওতা কন্দকে বাঘে ধরল। রূফাজানি বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াল— ‘‘দেখলে বাঘকে কেমন এ বন থেকে ও বনে তাড়িয়ে দিলাম।’’ ঠিক সেইদিন বিকেলবেলা এই গামেরনাড়ু পরজা হারানো বলদ খুঁজতে গিয়েছিল, তাকে বাঘে খেল। তারপরে কয়দিন একনাগাড়ে খুব কুয়াশা হল। লোকে বলল ‘‘বাঘই পাগ’’ কিন্তু তাই বলে সর্বদা ঘরে বসে থাকলে চলবে না। হাটে বাটে, ক্ষেতখামারে, কাজ করতে যেতেই হবে। সকলে দলবেঁধে সাবধান হয়ে বেরোয়। তাতেও রক্ষা নেই। ঘাটিপথে দশ পনেরো জনে একসঙ্গে যাবার সময় পাগলা কুকুরের মতন তেড়ে এসে বাঘ টেনে নিয়ে গেল। একদিন গ্রামের মেয়েরা মুরান নদীতে স্নান করছিল। ঘাটের উপর এসে বাঘ জিভ লক্ লক্ করে শুয়ে রইল। মেয়েরা ঘাটের কাছের ঝাঁকড়া গাছে পরনের কাপড় খুলে রেখে স্নান করছিল। ভয় লজ্জাকে পরাভূত করল। মেয়েরা চিৎকার করতে লাগল। গ্রাম থেকে চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক লাঠি, ভল্ল নিয়ে এসে তাড়া করায় বাঘটা পালাল। গ্রামের চারিধারের ঢিপি ও খোলাজমিতে সে নির্ভয়ে লাফ মেরে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে একটু অন্ধকার হলে জ্বলজ্বলে তারার মতন সবজে লাল চোখ দুটো এখানে সেখানে জ্বলতে থাকে। রূফাজানি তাবিজ দিল। এছাড়া লোকে হাতে, গলায়, কোমরে গারিড়ি মন্ত্রে সিদ্ধ কত কিছু ধারণ করে থাকে তবুও তাদের বাঘে ধরে। এক মাসের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে কুড়িজনকে বাঘে খেল। তবুও নিস্তার নেই।

গ্রামের সর্বনাশ হল। এ রকম বাঘের উপদ্রব কখনো দেখা যায়নি। ধারে কাছের অন্যান্য গ্রামে বাঘে ধরে, কিন্তু এ গ্রামটা কপালগুণে এতদিন রেহাই পেয়েছিল। পাঁচ বছরে গড়ে একজন বাঘের পেটে গেল ভাবা হত অনেক।

আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করে। কখন কি হয়? নায়ক মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে কাল সকালে রাজবাড়ি থেকে রিবিন্যু এসে চাইলে খাজনা কি করে দেওয়া হবে? রায়েতরা ভেবে ভেবে হয়রান। জঙ্গলী জায়গা বলে একটু কাঠ আনতে হলে বনে যেতে হয়। এ গ্রাম থেকে পাশের গ্রামে যেতে হলে পথে বন পড়বে এত কথা কেন? চাষের কাজ করতে গেলে ক্ষেতের ধারে বন। বনের ভিতরে বাঘ লুকিয়ে আছে, কোথা থেকে ছুটে এসে ধরে নিয়ে পালাবে।

একদিন খুব ভোরে বুড়ো জমাদার জানি গ্রামের এক প্রান্তে পায়খানা করতে বসেছিল। সেখানে জঙ্গল নেই! মুরান নদীর ধার পর্যন্ত শুধু বুক অবধি উঁচু ফিরিঘাস।

হঠাৎ বাঘ ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

এত দুঃখে বিপদেও সকলে বাধ্য হয়ে বাইরে বেরোয়— না হলে ক্ষেতের পাচি মাটিতে ঝরে পড়বে। খেয়ে বাঁচতে আর কিছুই থাকবে না। চাষের বলদরা সব মরে গেছে। সামনের বছরে চাষের কাজ কিভাবে হবে কেউ জানে না। আর এ বছর যদি ক্ষেতের পাচি ঘরে তোলা না যায় সকলে আঁকু পাঁকু করে মরবে।

সবাই একসাথে লাঠি, বর্শা, কুড়ুল হাতে আজ এর ক্ষেতে, কাল ওর ক্ষেতে ফসলকাটা কাজ শেষ করল। বেশি লোক জোরে জোরে চিৎকার চেঁচামেচি করলে বাঘ আসে না। কাজকর্ম সেরে রাত হলে, সকলে চুপ্‌চাপ্ গ্রামে থাকে। কোথাও বেরোয় না। ছাঁচতলায় নিত্যকর্ম সারে। ক্রমশ গ্রাম খুব নোংর হয়ে গেল। এইভাবে সাতদিন কেটে গেল, কাউকে বাঘে খেল না। তারপর যেই লোকে একটু ঢিলে দিল, তিরিশ চল্লিশ জনের বদলে পাঁচদশজন একসাথে বেরুল আবার বাঘে ধরল।

বাঘ যেন মৃত্যুর নিশ্চিত পরোয়ানা। বাঘের কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে ভুলেও ‘‘দাদিবুড়া’’র কেরামতিতে অবিশ্বাস করল না। লোকে বলে যার কপাল পোড়ে তাকে বাঘে খায়, আর কার কপাল পুড়বে এ তথ্য শুধু ‘‘দাদিবুড়াই’’ জানে। বাঘ তার দূত। এতদিন ‘‘দাদিবুড়া’’ প্রসন্ন ছিলেন, তাই সংসারে সুখ ছিল, কিন্তু আজ কোন অজানা কারণে ‘‘দাদিবুড়া’’ কুপিত হয়েছেন, তাই এ ধ্বংসের তুফান বইছে। কবে এসব থামবে কে জানে।

কারুর জীবনে নিশ্চয়তা নেই। অকাল পড়েছে। কথা বলতে গিয়ে লোকে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দেয়। কেউ সম্ভবত দাদিবুড়াকে রাগিয়ে দিয়েছে। একে অপরকে দোষারোপ করে, ঝগড়া করে। প্রথমে সকলে নায়ক ও আলেইবিরিয়াকে ধরেছিল। নায়ক তার দেওয়া ভোজের কথা মনে করিয়ে দিল। শাস্ত্র অনুযায়ী ভোজ দেওয়া হয়ে গেছে। আর কি দোষ? দোষ ধরতে লোকে পরস্পরকে চোখে চোখে রাখল। কাজের মানুষরা বাইরে বেরুতে না পেরে এবং কোন সমাধানে পৌঁছাতে না পেরে দিনদিন খিট্‌খিটে হয়ে উঠল। শুধু অশান্তি বেড়ে গেল। বাঘ খেতে খেতে একদিন রাতে গ্রামে ঢুকে বুদ্রা পরজাকে তার কুঁড়ে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। বুদ্রা পরজার স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদল। সকলে এল। বুদ্রা পরজা আর ফিরল না। এই ঘটনা দেখে লোকে ভয়ে কাঁপতে থাকল। নির্জন ক্ষেতে, কুঁড়ে ঘরে, ফসল পাহারা দিতে লোকে আগুন জ্বেলে শুয়েছিল, বাঘ সেখান থেকে তুলে নিয়ে খেয়েছে। আর এ গ্রামের ভিতর থেকে! এবছর হল কি?

এইভাবে পাহাড়ী দেশের কত গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। আজ আর তাদের চিহ্ন নেই। এই গ্রামেরও সেই দশা হতে চলেছে। ঘরে ঘরে উপোস উনুন ধরানো হচ্ছে না। সকলের মুখের হাসি নিভে গেছে। শুকনো চুপ্‌সানো মুখ। যে কটি গরু-বাছুর

বেঁচে আছে তাদের হাড় পাটকাঠির মতন গোনা যাচ্ছে। জীবন যাচ্ছে কি আসছে। প্রতি বাড়ি থেকে কান্নার রোল উঠছে। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? ওরা যেন নিজের ভাগ্যের সঙ্গে দাবা খেলে চুপচাপ্ চেয়ে বসে আছে। কখন কি অঘটন ঘটে যায় লোকে তার প্রতীক্ষায় থাকে। অশুভ সূচনা কিছু হল কি? কাক কয়বার কোনদিক্ থেকে কোনদিকে উড়ে গেল? পেঁচা কোথা থেকে ডাকল? শেয়ালকে কোন পথে দেখা গেল? বাইরে বেরুলে শেয়াল তো সহজেই, কচি বাছুরটাকে ভয়। সন্ধে হলে এদিক ওদিকের খুঁটিকে বাঘের মতন দেখায়। লোকে চুপি চুপি বলাবলি করে ঢিপির উপরে দাদিবুঢ়ার পায়ে কাছে বাঘটা এসে বসে থাকে। আরো ভয় বেড়ে যায়।

বুদ্রা পরজাকে নিয়ে যাবার রাত্রে শ্যাম গুরুমাঈ মনে মনে ভাবতে লাগল, কি যেন একটা নতুন বার্তা ওর পেট থেকে গলা অব্দি উঠে আসছে। দেবদেবী ওর উপরে ভর করেন, সে গুরুমাঈ, যে কোন ঠাকুর গ্রামের লোকেদের কিছু বার্তা পাঠাতে চাইলে শ্যাম গুরুমাঈকে নাচিয়ে নাচিয়ে তার মুখ দিয়ে তা বলাবে । শ্যাম গুরুমাঈ খুব ভীতু প্রকৃতির মানুষ। আর তার মনে হতে লাগল, কোন এক দেবতা যেন তাকে দিয়ে কিছু বলাতে চাইছেন। কাল হল, শ্যাম গুরুমাঈর চিন্তা ভাবনায় একটু ঢিলে পড়ল। সন্ধে হতেই আবার তার চিন্তা ভাবনা বাড়তে লাগল। সেইদিন রাতে বড় বাঘ গ্রামের চারিদিকে দাবড়ে ঘুরে বেড়াল ও ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল। ঘরের চালা শব্দের চোটে কেঁপে ওঠে, লোকে ভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে সময় কাটায়। শিশুরা কাঁদতে গিয়ে থম্‌কে থেমে যায়। শ্যাম গুরুমাঈ নিজের ঘরে ভয়ে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে তার মনে হল সে শ্যাম গুরুমাঈ নয়, সে যেন কেউ। কোন দেবতা যেন গুরুমাঈর মনটা দখল করে নিয়েছে। প্রতিবার বাঘের গর্জনের সাথে সাথে ওকে আশ্রয় করে থাকা দেবতার কথা তার মুখ দিয়ে বাইরে বেরুতে চেষ্টা করে। দেবতার বাহন হয়ে শ্যাম গুরুমাঈ থরথরিয়ে কাঁপে। সারা রাত ও দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। সকাল হতেই সে গিয়ে দিশারি রূফাজানিকে ধরল— তার কেমন কেমন লাগছে সব কথা তাকে বলল। নতুন দিশারির পুরোনো গুরুমাঈর কথায় অবিশ্বাস করার অধিকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে রূফাজানি নায়কের কাছে গেল। ঢাক ঢোল ভেরীর শব্দে কানে তালা ধরল। বাসি মুখে জল না দিয়ে লোকেরা গিয়ে গ্রামের *ভেরামনে* জড়ো হল। যেখানে তাদের পিতৃপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ছুঁচোল পাথর ও চ্যাপটা পাথর রাখা আছে। যেখানে নাচ গান থেকে পঞ্চায়েত সভা হয়।

লোকে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে এসে জড়ো হতে লাগল। শ্যাম গুরুমাঈ পাগলের মতন নাচছিল। দিশারি মন্তর আওড়াচ্ছিল। মাটিতে মুরগী কেটে তার রক্ত

ভেরামন— মাঝ রাস্তা

সেখানে ঢেলেছে। গুরুমাঈ নেচে নেচে যেন পুরো পাগল হয়ে গেল। চোখে অস্বাভাবিক জ্যোতি, মুখে অস্বাভাবিক ক্রূরতা— সে নাচতে নাচতে লুটিয়ে যায়। গড়িয়ে পড়ে, আর উঠে নাচে। উপস্থিত জনতার কাউকে কাউকে তাড়া করে। বাজনদারকে ধরে মারে। এ নাচ খুব ভয়ঙ্কর— আতঙ্কিত হয়ে লোকে দেখতে থাকে, আর নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে বলাবলি করে— সকাল থেকে একি অমঙ্গলের সূচনা!

নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে গুরুমাঈ বিকট অট্টহাসি হেসে ফেটে পড়ল। লোকেরা ভয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, হো হো করে হেসে, জিভ লক্ লক্ করে, দাঁত খিচিয়ে বলল— খেয়েছি, খেয়েছি, খেয়েছি, গুনে গুনে দুকুড়ি তিনজনকে খেলাম— দুকুড়ি তিনজনকে খেলাম।”

রক্তশূন্য মুখে নিশ্বাস বন্ধ করে লোকেরা শুনল। সে আবার বলল— “আমি সব চেয়ে বড় ঠাকুর— “দাদিবুঢ়া”। আমি সব গড়ি, আবার আমি সব ভাঙি। যখন যেটা আমার মনে হয়। যাকে আমার ইচ্ছা খেয়ে নিলাম, যাকে ইচ্ছা রাখলাম। আমার ইচ্ছা আমার খুশি, আমি সবচেয়ে বড় ঠাকুর “দাদিবুঢ়া”। কিসের জন্যে আমি কি করি আমাকে জিজ্ঞাসা কর না। সেটা একমাত্র আমি জানি। আমি সবথেকে বড় “দাদিবুঢ়া”, আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, আমি বলব না। যাকে খেতে ইচ্ছা হল তাকে খেলাম, যাকে রাখতে ইচ্ছা হল, তাকে এখন অবধি বাঁচিয়ে রেখেছি। মাত্র একটা কথা তোমাদের বলব বলে ভাবছি— এখানে আশেপাশে খুব বেশি *বাঘডুমার*রা থাকছে। তোমরা সকলে এই গ্রাম ভেঙে দিয়ে, এখান থেকে উঠে চলে যাও। না হলে তোমাদের ভাল হবে না। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তোমরা সুখী হলে, আমার সুখ, সেইজন্যে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি— যাও বাছারা, এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। সূর্য ওঠার দিকে, গাদি পাব্‌লি ডঙ্গরের নিচে অনেক জায়গা পড়ে আছে। সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি কর। এ জায়গা ছেড়ে চলে যাও। এখানে আমার সঙ্গী দেবতারা ঘোরাঘুরি করবে। বাঘডুমারাও থাকবে। এখানে তোমাদের ভাল হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে চলে যাও, সেখানে বেশি ভাল হবে। তোমরা যেদিকে যাবে, তোমাদের সুখ দুঃখ বুঝতে আমি সর্বদা তোমাদের কাছাকাছি থাকব। যাও যাও।” গ্রামের সব লোকেরা লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে প্রণাম করে বলল— “দাদিবুঢ়া, তোর ইচ্ছা, তোর দয়া, রাখলে তুই রাখবি, মারলে তুই মারবি, তোর কথা কিন্তু আমরা অমান্য করব না, তোর কথায় আমরা যাব, কেবল তোর দয়া ভিক্ষা করি প্রভু।”

বাঘডুমা— যাকে বাঘে খায়, তার প্রেতাত্মা

শ্যাম গুরুমাঈ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। ওর উপরে ঠাকুরের ভর ততক্ষণে ছেড়ে গেছে।

১৮

গ্রামে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। গ্রাম ভেঙে ফেলতে হবে। কতকালের পুরোন গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। পিতৃপুরুষদের অস্থি ও চিতাভস্ম আর গ্রামের রাস্তায় যত ছুঁচোল ও যত চ্যাপটা পাথর পিছনে পড়ে থাকবে। গাদি পাব্‌লি ডঙ্গর এখান থেকে দূরে নয়। মাঝখানে আড়ল করে আছে পাচেড়ি পর্বত ও চেলিবেড়া জঙ্গল— তা না হলে দেখা যেত। সেখানে গ্রাম বসাতে চাষের চমি বা ঘর তৈরির ডাঙ্গা জমি কিছুই নেই। কিন্তু দাদিবুঢ়ার আদেশ অমান্য করা চলবে না। যেতেই হবে।

এই শীতকাল শেষ হলে বন শুকিয়ে যাবে। তখন বাঘের উৎপাত কিছুটা কমে যাবে। তখন হয়তো এই গ্রামে ক্ষেতে চাষের কাজ করতে আর বাধা থাকবে না, কিন্তু "যাব না" বলতে কারুর বুকের পাটা নেই। দাদিবুঢ়া যা নিষ্পত্তি জানাল, সেটা মাথা পেতে নিতে হবে। যেতেই হবে।

এলিয়ো প্রাচীন্ নায়ককে ডেকে বলল— "তুই কি পাগল হয়েছিস্? নায়ক, কি দাদিবুঢ়া, ফাদিবুঢ়া? পিতৃপুরুষের গ্রাম ছেড়ে কোথায় যেতে বেরিয়েছিস্? এত যত্ন করে তৈরী ঘরবাড়ি এত বেড়া ঘের ক্ষেত জমি— ওখানে কি আছে যে যাবি?"

নায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রামের দিকে তাকিয়ে চুপ্‌চাপ্ দাঁড়িয়ে রইল। "কেন চলে যাবি? নায়ক, আমি বুড়োমানুষ, আমার কথা শোন। রোদের তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের উপদ্রব কমে যাবে। কেন ভিন্‌দেশে গিয়ে হয়রান হব? কাপালে মরণ থাকলে— কে আটকাবে? এই পাগলামি ছাড়।"

একদিকে গ্রাম, অন্যদিকে টিপির উপরে "দাদিবুঢ়া" বিরাজমান। তাকে মাঝখানে রেখে চারিদিকে চাষের জমি। নায়ক মাথা নাড়তে লাগল, বলল— "দুকুড়ি তিনজন লোককে বাঘে ধরে ধরে খেল। যত গাইগরু ছিল, সব মড়কে মারা গেল— আর এখানে কেন? তোমাদের ধর্মে দাদিবুঢ়া নেই, কিন্তু আমাদের ধর্মে আছে। দাদিবুঢ়া বলে দিয়েছেন, এখন তোমাদের ইচ্ছা, আমাদের সঙ্গে যাবে, না, তোমাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে এখানে থাকবে?" এলিয়ো প্রাচীন অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। নায়কের এক কথা "আর এখানে কেন?" এইটুকু যেন ওর মনের গভীরের নিভৃত অভিযোগ। সেই কবে থেকে সেটা মনে গেঁথে আছে। দাদিবুঢ়া শুধু উপলক্ষ মাত্র।

তার ঠেঙ্গাজানি চলে গেছে, তার একটা হাত যেন কাটা গেছে। ওর মুখে শুধু একটা কথা "এখানে আর, এর বেশি কি হবে?" এলিয়ো প্রাচীন নিজের পাড়ায় গিয়ে তার জাতের লোকদের ডেকে অনেক ভাবে বোঝাল— এই পরজা লোকেরা খুব ভীতু, আর এমন মানুষ, একবার যা বুঝবে তার অন্যথা হবে না। এরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আমরা চাইলে এরা জমি-বাড়ি শস্তায় আমাদের বিক্রি করে দেবে। আমরা এখানে থাকব, ওরা যাচ্ছে, যাক্‌গে। মাত্র দশ বার ঘর ডোম পরিবার— এলিয়ো কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারল না। তার বলল— "এই বনের মধ্যে আমরা একা একা থেকে কি লাভ? একে এই গভীর বন, তাতে আবার বাঘের ভয়। বাড়ি থেকে বেরুতে পারব না। কার জীবনের ভয় নেই, এখানে একলা পড়ে থাকবে?" সকালে গ্রামের রাস্তায় তারা গুরুমাঈর ভয়ঙ্কর নাচ দেখেছিল ও তার বলা কথাও শুনেছিল। মনের কোনো আদিম বিশ্বাসের মাটিতে দাদিবুঢ়ার শিকড় গেড়ে বসে আছে। এলিয়ো প্রাচীন পারল না।

দিশারি গিয়ে নতুন জায়গায় শুভ সূচনা করল। নায়কের সাথে রায়েতরা গিয়ে সেখানে সীমানা চিহ্নিত করে এল। একদিকে পাব্‌লিক পর্বত অন্যদিকে পাচেরি পর্বত, মাঝে খুব বড় উপত্যকা। সেখানে এখন জঙ্গলে ঢাকা, ধীরে ধীরে জঙ্গল সরে গিয়ে, ধান ও জোয়ারের ক্ষেত ছড়িয়ে যাবে। গাদি পাব্‌লিক ঢালের নিচে নতুন গ্রাম বসানো হবে। ওইখানটায় মুরান নদী খুব চওড়া দুদিকের পাহাড় থেকে নদীর দিকে কত মেঠো ঝোলা বয়ে এসেছে। তাদের জল নিকেশ করে দিয়ে, বাঁধ দিয়ে দিলে অনেক ধান জমি তৈরি হবে। এই বছর গরমে দুইদিকে পর্বতের ঢালুর গাছ কেটে পুড়িয়ে দিলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন সেখানে জোয়ার, সুঁয়া, *অল্‌সী* অড়হর রেড়ি সব কিছুর ক্ষেত তৈরি হবে। দাদিবুঢ়া বলেছে এখানে আরো বেশি ভাল হবে।

জমি চাষ করতে দাদিবুঢ়া বারণ করেনি। সে গ্রামের জমি, এ গ্রামের জমি যতদিন সম্ভব হবে দুইগ্রামের জমি চাষ করবে। পাচেড়ি পর্বত আড়াল করে রয়েছে, আসলে পর্বতের ও পাশটায় তো।

গ্রামর সব পাড়া— পরজা পাড়া, ডোম পাড়া চিহ্নিত করা হল। গ্রামের মাঝরাস্তা, জল আনতে যাবার রাস্তা, স্নানের ঘাট সর্বত্র পুজো দিয়ে পবিত্র করা হল। প্রথমে তালপাতার ছোট ছোট কুঁড়েঘর, ধীরে ধীরে বড় ঘর বাড়ি তৈরি করা হবে একটু কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঁচদিনের মধ্যে সব জিনিস নতুন গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল। পুরনো চালা থেকে ভাল ভাল বাঁশ, কাঠ, দরজা, চৌকাঠ, দরমা সব তারা বয়ে নিয়ে চলল। একদিন এই বয়ে নিয়ে যাওয়া শেষ হল। পুরোন গ্রাম ভেঙে গেল। নতুন গ্রাম তৈরি শুরু হল।

ওরা চলে গেল। ওরা শুধু রেখে দিয়ে গেল গ্রামের মাঝ রাস্তা বরাবর ছড়ানো

অল্‌সী— তৈল বীজ

সারি সারি ছুঁচোল ও চ্যাপটা পাথররাশি, ভাঙা হতশ্রী ঘরবাড়ি, নিভন্ত উনুনের গাদাগাদা ছাই ও পাঁশ।

ওরা ঝড়ের মতন চলে গেল। এখানে এখন সব নিস্তব্ধ। আর ঘরের চালা থেকে ধোঁয়া উঠবে না। পথে গোবর ও জঞ্জাল জমা হবে না। ঘরের দরজার সামনে শিশুরা ধুলো ছড়াবে না। সন্ধ্যায় বনের রাস্তা ধরে লোকেরা ও দল বেঁধে গরু বাছুররা ফিরে আসবে না। জ্যোৎস্না রাতে জমজমাট নাচ হবে না। ঝগড়া বিবাদ নেই। হাসি আনন্দ নেই। চিরদিনের জন্যে সব স্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল।

শুধু টিপির উপর দাঁড়িয়ে রইল মানুষের প্রতিষ্ঠিত ঠুঁটো খেজুর গাছে "দাদিবুঢ়া"। লোকে তাকে গড়েছিল, আবার তারাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। তখন সব পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে শবদেহে পরিণত হল। ওর অমর আত্মা, আবার অন্য কোন গ্রামে জন্ম নেবে। সেখানে সে আবার ধাংড়ী নাচাবে। ঘরে ঘরে আমের কসির মতন অসংখ্য শিশু জন্ম নেবে। সেখানে সে কত জাদু দেখাবে। কোল ভরে যেমন দেবে— বন্যা শুখা, মড়ক সবই করাবে। সে চিরন্তন।

ক্রমশ একে একে সব চালা ভেঙে পড়ল। উইর ধার লাগল। মাটির দেয়াল ধসে পড়ে মাটির স্তূপে পরিণত হল। জঙ্গল এগিয়ে এসে সব কিছুকে যেন গ্রাস করল। তার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল ধাংড়া ঘর ও ধাংড়ী ঘর— যেখানে ছেলেমেয়েরা রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে ডুংডুঙ্গা বাজিয়ে গান গেয়ে প্রেম ভালবাসার পসরা মেলে দিত। ঠেঙ্গাজানি ও সারিয়াদানের বিয়ে হত। ওদের ঘর তৈরি হত, কিন্তু এখন কোথায় সেই আধতৈরী ঘরখানি?

টিপির উপরে হুঁকোবুড়ো 'দাদিবুঢ়ার' উপর চড়াও হল। দুই বুড়ো মিলেমিশে এক, অদ্বৈত হয়ে গেল।